সপ্তম অধ্যায়

উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার নাট্যমঞ্চ ও নাট্যব্যক্তিত্ব

দিনাজপুজেলার ঐতিহ্যময় নাট্যচর্চার প্রয়োজনে সৃষ্ট নাট্যমঞ্চ বা নাট্যশালার প্রাক্‌কথা:

বাংলায় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে পুঁজিবাদী ব্রিটিশ বাণিজ্যিক সভ্যতা ও সংস্কৃতির অন্যতম অবদান 'থিয়েটার' লেবেদফীয় (রুশদেশবাসী) ধারায় কলোনিয়াল রাজধানী কলকাতায় গড়ে ওঠে। ফিরিঙ্গিদের আমদানি করা থিয়েটারের রস আস্বাদনের জন্য কোলকাতার পাশ্চাত্য শিক্ষা-সংস্কৃতি প্রেমী বাঙালিরা সংস্কৃতিচর্চার স্বাদপরিবর্তনের তাগিদে বেশি উদগ্রীব হয়ে উঠেছিল। সেই সব উৎসাহী ও অনুরাগীদের সংস্কৃতির রসাস্বাদনের চিরন্তন পিপাসা তৃপ্তির উদ্দেশ্যে বিশিষ্ট জমিদার প্রসন্নকুমার ঠাকুর ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দে বাঙালির প্রথম স্থায়ী নাট্যশালা 'হিন্দু থিয়েটার' নির্মাণ করেন। এ নাট্যশালা সম্পূর্ণ সেকালের বিদেশী ভাবধারায় তৈরি হলেও, যেখানে বাঙালিয়ানার নিজস্ব রং, রুচি ও চিন্তা-চেতনার প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। এই কলকাতা শহরে প্রথম নাট্যশালা ও নাট্যসমাজ গড়ে ওঠার পঞ্চাশ বছরের মধ্যে কলকাতার পার্শ্বস্থ অন্যান্য অঞ্চলের পাশাপাশি বাংলার বেশ কয়েকটি মফস্বল শহরেও নাট্যশালা সহ নাট্যসমাজ গঠিত হতে শুরু করে। তার মধ্যে দিনাজপুর শহর ছিল অবশ্যই অন্যতম। এই কারণে যে দিনাজপুর অবিভক্ত বাংলার একটি সংস্কৃতিমনস্ক শহর। এই প্রসঙ্গে জেলার বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক শুভাশীষ গুপ্ত জানিয়েছেন— ''দিনাজপুর জেলাসদর অবস্থিত ছিল কলকাতা থেকে ৩০০ মাইলেরও বেশি দূরে। দিনাজপুরে যখন নাটকের পত্তন হয়েছিল, তখন সবেমাত্র নাটকের উপযোগী সমাজিক পরিকাঠামো তৈরি হতে শুরু করেছে। আধুনিক নাট্য-ব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রায় শতবর্ষ পূর্ব থেকে কলকাতায় আধুনিক ধনতান্ত্রিক সমাজ ও পরিকাঠামোর সূচনা হয়েছিল। কিন্তু এ জাতীয় পটভূমিকা তথা প্রয়োজনীয় সমাজ গঠনের অসম্পূর্ণ অবস্থাতেই দিনাজপুরের সূত্রপাত ঘটে আধুনিক রঙ্গমঞ্চের। কলকাতা থেকে বহুদূরে এবং যাতায়াত ব্যবস্থায় যথেষ্ট সময় অপচয় ও বিড়ম্বনা এবং অর্থ ব্যয় করতে হতো দিনাজপুর বাসীকে। ফলে প্রথম পর্বের নাটকের কালে সাধারণ পরিবার থেকে আগত নাট্যাভিনেতারা কলকাতা মঞ্চের অভিজ্ঞতা গ্রহণ করার সুযোগ পেতেন না। নাট্য-প্রযোজনা ও পৃষ্ঠপোষকতার জন্য দিনাজপুরের নাট্যমঞ্চকে শুরুর পর্বে পুরোপুরি নির্ভর করতে হয়েছিল এলাকার রাজা-মহারাজা-জমিদারদের উপর... অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, প্রশাসনিক, সাংস্কৃতিক ও পরিকাঠামোগত এই ঐতিহাসিক অসম্পূর্ণতা এবং তার সাথে সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার প্রচণ্ড পশ্চাদপদতা, কুসংস্কার, প্রতিবন্ধকতা সমূহের বিরুদ্ধে এক ধরনের লড়াই করে দিনাজপুর জেলায় আধুনিক রঙ্গালয়ের উত্থান ও বিস্তার ঘটেছিল।''[১]

দিনাজপুর জেলায় ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দে আধুনিক মঞ্চভিত্তিক থিয়েটারের সূচনা হয়েছিল রাজবাড়িতে 'কোহিনুর থিয়েটার' সৌখিন নামের মধ্যে দিয়ে। তারপর ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে দিনাজপুরে নাট্যসংস্থা স্থাপিত হয়— মহারাণী ভিক্টোরিয়ার রাজত্বকালের ষাট বছরে 'ডায়মণ্ড জুবিলি থিয়েটার কোম্পানী' নাম দিয়ে যা ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে স্থায়ী 'ডায়মণ্ড জুবিলি হল'- রূপে গড়ে ওঠে। এই সংস্থা পরবর্তীকালে ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে তৈরি হয় দিনাজপুর নাট্যসমিতি। দিনাজপুরে নাট্যমঞ্চ স্থাপন ও বিকাশের সামাজিক পরিকাঠামো তৈরি হয়েছিল নগরায়ণ ও মধ্যবিত্ত সমাজের গঠন ও বিস্তারের প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে। এই সম্বন্ধে জেলার প্রখ্যাত নাট্যকর্মী ও বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক শুভাশীষ গুপ্তের যুক্তি সঙ্গত মন্তব্য প্রানিধানযোগ্য— ''দিনাজপুর শহরে আধুনিক সামাজিক পরিকাঠামোর বিকাশই দরজাতে কড়া নাড়ছিল নাট্যমঞ্চ গড়ার দাবি নিয়ে। অর্থবান পৃষ্ঠপোষক বা উদ্যোক্তা পেলেই পাবলিক থিয়েটার গড়ে ওঠে না। চাই স্থায়ী দর্শক। যাত্রা, কবিগান, কথকতা, পাঁচালী, নটঙ্গী প্রভৃতি সামন্ততান্ত্রিক পর্বের সংস্কৃতি থেকে ধনতান্ত্রিক আধুনিক সংস্কৃতি— 'প্রসেনিয়াম'মূলক নাটকের পর্বে প্রয়োজন হয় মধ্যবিত্ত-নিম্নবিত্ত অংশকে, মূল দর্শককুল হিসাবে। দিনাজপুর শহরে এই সময়ে নাটক-আকাঙ্ক্ষী মধ্যবিত্ত-নিম্নবিত্ত স্তর গড়ে উঠেছিল কিছুটা। তবে এই পর্বে দিনাজপুরে নাটকের প্রতিষ্ঠাকে সংস্কৃতির এক বিকাশ হিসাবে বিবেচনা করা যায় না। বরং বিবেচনা করা শ্রেয় হবে আধুনিক এক পরিশীলিত বিনোদনের আত্মপ্রকাশ হিসাবে। বিংশ শতাব্দীতে প্রবেশ করার করই কেবল দিনাজপুরের নাটক, পারফর্মিং আর্টের চরিত্র অর্জন করে। নাট্য-প্রযোজনাতেও মধ্যবিত্তের প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণ এবং স্থায়ীমঞ্চের প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে শুরু হয় শহরের থিয়েটারের সংস্কৃতির গুণাবলি অর্জন করা।''[২]

মোটকথা এই জেলায় পরম্পরাগত স্থানীয় সংস্কৃতি বহির্ভূত এবং পরিচালিত গ্রাম্য সংস্কৃতি ধারার উপরে বাইরে থেকে আমদানিকৃত থিয়েটার সংস্কৃতি আরোপিত হয়েছিল। দিনাজপুর শহর জেলার রাজধানী হওয়ার ফলে স্বাভাবিকভাবে সেখানে জেলার বিভিন্ন স্থান থেকে মানুষের যাতায়াতের তথা যোগাযোগের সুবাদে জেলার অন্যত্রও সাময়িক মঞ্চ বানিয়ে নিয়ে নাট্যাভিনয় শুরু হয়েছিল। পরিশেষে একথা দৃঢ়তার সঙ্গে বলা যায় যে, দিনাজপুর নাট্যসমিতি বিভক্ত ও অবিভক্ত দিনাজপুরবাসীর গৌরব। এর কারণ স্বরূপ বলা যায় দিনাজপুর রঙ্গালয় পরবর্তী প্রজন্মকে ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারের মাধ্যমে সমৃদ্ধ করে তুলেছিল। তার ফলে বালুরঘাট, রায়গঞ্জ মহকুমা সহ স্বাধীনতা পরবর্তী বিভিন্ন থানাশহরে গ্রামাঞ্চল বা মফস্বলে নাট্যসংস্থার জন্ম ও বিকাশের ক্ষেত্রে দিনাজপুর জেলার উত্তরাধিকারের অনুপ্রেরণা অবশ্যই কার্যকরী ভূমিকা পালন করেছিল।

উত্তর দিনাজপুর জেলার নাট্যমঞ্চের রূপরেখা:

১. রায়গঞ্জ ইনস্টিটিউট : রায়গঞ্জ উত্তর দিনাজপুর: ১৯৩৯ খ্রি:

১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে যতীন্দ্রমোহন কলকাতা থেকে রায়গঞ্জ চলে এলেন। যতীন্দ্রমোহন রায়গঞ্জের কিছু মানুষকে নিয়ে একদিকে নাট্যদল গঠন করেন আবার তার পাশাপাশি সাধারণ শ্রমজীবি মানুষদের তালিম দিয়ে তাদের দক্ষ সঙ্গীত শিল্পী হিসেবে গড়ে তুললেন। সেই সঙ্গে এই উত্তর দিনাজপুর জেলার নাট্যচর্চার ক্ষেত্রে অবিভক্ত দিনাজপুর জেলার যথেষ্ট ভূমিকা পরিলক্ষিত হয়। তখন রায়গুঞ্জ ছিল ছোট্ট একটি পুলিশ চৌকি মাত্র অর্থাৎ ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দে রায়গঞ্জ অবিভক্ত দিনাজপুর জেলার সদর মহকুমার অধীনে থানা ও চৌকি ছিল। ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে দিনাজপুরে ৩০টি থানা গঠনের ফলে রায়গঞ্জ এক স্বতন্ত্র থানা হিসেবে আবির্ভূত হলেও তা বাস্তবায়িত হয় ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে। তখন হেমাতাবাদ থানা থেকে ১৪১ বর্গমাইল এলাকাকে আলাদা করে নিয়ে রায়গঞ্জ থানার প্রতিষ্ঠাতা হয়। এবং এই সময়ে পূর্ণাঙ্গ থানার সঙ্গে সঙ্গে মুন্সেফী আদালত ও রেজিস্টার অফিস গঠিত হয়। এই রাজয়ঞ্জে গিরি— গোঁসাই পরিবারের বন্দরস্থ বাসভবনে মৌখিক নাট্যাভিনয়ের মধ্য দিয়ে নাটকের প্রথম সূত্রপাত হয়েছিল। কিন্তু একটি স্থায়ী নাট্যমঞ্জ প্রতিষ্ঠার জন্য স্থানীয় নাট্যমোদীদের মধ্যে প্রবল উৎসাহ ও উদ্যমতা দেখা দেওয়ায় এগিয়ে এলেন দিনাজপুর এস্টেটের রাজ কাছারির নায়েব সুরেন শিকদার। যতীন্দ্রনাথ গোঁসাই, উপেন্দ্রনাথ বসু, কামিক্ষা চ্যাটার্জী, করোনেশন স্কুল-এর প্রধান শিক্ষক দামোদর প্রামাণিক, উকিল সুকুমার গুহ, উকিল কুলদাকান্ত মিত্র, ডা: জগদীশচন্দ্র সেন, উকিল নির্মলকুমার ঘোষ, মৌলবী মুহম্মদ আব্দুল গনি, উকিল গোলাম হামিদুর রহমান প্রমুখ গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ। এরফলে ১৯৩০-এর দশকের মাঝখানে তাঁদের উদ্যোগে স্থায়ী মঞ্চ নির্মাণের জন্য জমি সংগ্রহ হল এবং একটি কমিটি গঠন করে তার দায়িত্ব প্রাপ্ত সম্পাদক হলেন সুরেন শিকদার। ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে দিনাজপুর মহারাজার কাছে রাজ কাছারির বিপরীত অংশের এক জলা জমি মঞ্চ নির্মাণের জন্য আবেদন করা হয় দান হিসাবে মঞ্জুর করার জন্য।

১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দের পূর্বে 'রায়গঞ্জ টাউন ক্লাব' (ফুটবল খেলার জন্য) তৈরি হয়। আর একটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান 'সাধনা সাহিত্য মন্দির' প্রথমে শিউধনিরাম, পরবর্তীতে 'রাধাবল্লভ দাসের ভাড়া বাড়িতে স্থাপিত ছিল। এরপর পূর্বোক্ত প্রতিষ্ঠাটি ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দের ২৭শে জুন আর একটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান 'বীণাপাণি সমিতি' সঙ্গে একীভূত হয়ে কামিক্ষ্যা প্রসাদ চ্যাটার্জীর বাড়িতে 'রায়গঞ্জ পাবলিক লাইব্রেরী' নামে প্রচলিত হয়। ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে 'টাউন ক্লাব', সাধনা সাহিত্য মন্দির' বীণাপানি পাঠাগার ও 'রায়গঞ্জ নাট্যসমিতি' একত্রিত করার প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং তার ফলে গড়ে ওঠে রায়গঞ্জ ইন্সিটিটিউ। সুরেন শিকদারের নেতৃত্বাধীন কমিটি দিনাজপুর মহারাজার

দেওয়া শর্ত অনুযায়ী রায়গঞ্জ ইন্সিটিটিউটের হলের নাম 'মহারাণী স্নেহলতা হল' এবং সংলগ্ন মাঠের নাম 'মাহারাণী স্নেহলতা পাক' মেনে নিয়ে ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে সক্রিয়ভাবে কাজ শুরু করেন। মহারাজা কর্তৃক প্রদত্ত জমির সেটেলমেন্ট পরিচয় নিম্নে তুলে ধরা হল— মৌজা রায়গঞ্জ, জে এল নং— ১৫৩, দাগ নং ৮২৩ ও ৮২৪। রাজকাছারীর দক্ষিণ পার্শ্বে অবস্থিত একটি পুকুরের মাটি কেটে উক্ত জলাজমি ভরাট করা হয়। এরপর ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দের ২৯ ডিসেম্বর হাতে আঁকা প্ল্যান এবং এস্টিমেটের ভিত্তিতে দিনাজপুরের মুন্সিপাড়ার দাস 'ব্রাদার্স' নামে একটি সংস্থা কাঠ ও টিনের ছাদ নির্মাণের ব্যয় বাবদ ১৫০০ টাকার একটি 'কোটেশন' জমা দেয়। তখন ইন্সিটিটিউটের উদ্দেশ্য ছিল এর কর্মকাণ্ড ৪টি বিভাগ নিয়ে চলবে, যথা ১. গ্রন্থাগার বিভাগ, ২. খেলাধূলা বিভাগ, ৩. নাট্যবিভাগ, ৪. সেবা ও সংস্কৃতি বিভাগ। ২৮ জানুয়ারি 'স্নেহলতা হল' নির্মাণের কাজ শুরু হয়। ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দের ১৭ মার্চ ভিত্তি প্রস্তর স্থাপিত হয়। তবে 'স্নেহলতা হল' নির্মাণের কাজ অসমাপ্ত অবস্থাতেই দুটি নাটক যথা— 'দুই পুরুষ' ও 'পাঞ্জাব কেশরী রণজিৎ সিং' ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দের ৩ মে অভিনীত হয়। সর্বোপরি নাট্যসংস্থার প্রাপ্ত একটি সীল থেকে জানা যায় ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে রায়গঞ্জ ইনস্টিটিউট আনুষ্ঠানিক ভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। এভাবেই নানা চড়াই উৎরাই পেরিয়ে হলের সম্মুখভাবে 'মহারাণী স্নেহলতা হল পার্কের গেটে 'মহারাণী স্নেহলতা পার্ক' আর রায়গঞ্জের মহারাজার আবক্ষমূর্তি থাকবে হলের সম্মুখভাগে— এই শর্তে পাওয়া একটি ডোবা জমিতে নির্দেশ মতো পার্ক ও হলের সীমারেখা শ্রদ্ধার সঙ্গে মেনে নিয়ে ও তাঁর বিভিন্ন দিক থেকে সাহায্য পেয়ে সংস্থার পরিচালন সমিতির আপ্রাণ প্রচেষ্টায় এই প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে।

১৯৩৯ খ্রি: হলঘরের একটি অংশ ছোট্ট করে তৈরি হওয়ার পর সংস্থার কাজ শুরু হয়। সর্বোপরি এই নাট্যসংস্থার প্রাপ্ত একটি রাউন্ডসীল থেকে জানা যায় যে, ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে রায়গঞ্জ ইনস্টিটিউট আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। মোটকথা এই রায়গঞ্জ ইনস্টিটিউট সুস্থ সাংস্কৃতিক পরিবেশের প্রয়োজনেই গড়ে উঠেছিল এবং এই নাট্যসংস্থা রায়গঞ্জের সাংস্কৃতিক জগতের ধারক ও বাহক তথা মূলকাণ্ডারীর ভূমিকা পালন করেছিল।

২. ছন্দম, রায়গঞ্জ, উত্তরদিনাজপুর: ২১.৩.১৯৭৪।

রায়গঞ্জ ইনস্টিটিউটে ষাটের দশকের গোড়ার দিকে নিয়মিতভাবে নাট্য-প্রয়োজনা হত। ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে রবীন্দ্রজন্ম-শতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে সারারাজ্যের সঙ্গে রায়গঞ্জে ও রবীন্দ্রচর্চার মধ্য দিয়ে রবীন্দ্র নাটক বিশেষ করে কাব্য নাট্য, গীতিনাট্য, নৃত্যনাট্য এবং ছোটগল্পের নাট্যরূপ প্রযোজনা বেশ আড়ম্বরের সহিত পালিত হয়। এবং এই বিষয়কে কেন্দ্র করে রায়গঞ্জ ইনস্টিটিউটের নাট্যশক্তি দ্বিধাভক্ত হয়ে পড়ে। এইরূপ অবস্থায় নাট্যশক্তির প্রধান অংশই আলাদাভাবে রবীন্দ্রশতবর্ষ

উদ্‌যাপন করে এই ঘটনার ফলে উদ্ভূত পরিস্থিতির পরিবর্তন ও সংঘাতের মধ্য দিয়ে ছন্দম নাট্যসংস্থা সৃষ্টির প্রধান কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এই প্রসঙ্গে জেলার বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব ও প্রাবন্ধিক সুভাশীষ গুপ্তের মূল্যবান মন্তব্য উল্লেখ করা যায়— ''রায়গঞ্জের রঙ্গালয়ের ইতিহাসের এক যুগসন্ধিক্ষণে আবির্ভাব 'ছন্দম' নাট্যসংস্থার। ... রমেন্দ্রপল্লীর দুগামণ্ডপের মাঠে প্রথম অভিনয়চর্চা শুরু করেছিলেন 'ছন্দম'-এর শুরুর পর্যায়ের স্কুল কলেজের পড়ুয়া কোনও কোনও যুবক-যুবতী। ... 'ছন্দম'-এ প্রথম থেকেই শুরু হয়েছিল স্ত্রী-পুরুষের সম্মিলিত অভিনয় এইভাবে প্রথম থেকে তাঁরা ভেঙ্গেছিলেন রক্ষণশীলতা ও পশ্চাদপদতার সমস্ত প্রাচীরকে, অগ্রগতির রথের চূড়ায় উড়িয়ে দিয়েছিলেন বৈজয়ন্তী। ... প্রকৃত প্রস্তাতে রায়গঞ্জের পরিসরে নাট্য আন্দোলন বলতে যা বোঝায়, ... শুরু থেকেই তার চিহ্ন সৃষ্টি হয় 'ছন্দম'-এর জন্ম সূতিকাগারে। এটিই তার শ্রেষ্ঠ পরিচয়। রায়গঞ্জ ইনস্টিটিউট-এ পরিচালন মণ্ডলী গঠনে সদস্যদের ভোটদানের গণতান্ত্রিক অধিকার থেকে যাঁদের সম্পূর্ণ বেআইনিভাবে ও জবরদস্তি করে বঞ্চিত করা হয়েছিল, তাঁরা নিজস্ব সংগঠন গড়ে রায়গঞ্জে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সাংস্কৃতিক জগতে নয়া গণতন্ত্রকে।''৪

মোটকথা, রায়গঞ্জ ইনস্টিটিউট থেকে বহিষ্কৃত ও বিদ্রোহী যুবক-যুবতীরা অর্থাৎ প্রগতি পন্থী যুবকেরা সংঘবদ্ধ হয়ে ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দের প্রথমের দিকে রবীন্দ্র শতবার্ষিকী উদ্‌যাপন করার জন্য রবীন্দ্রনাথের গল্পের নাট্যরূপ 'কাবুলিওয়ালা' মঞ্চস্থ করার উদ্যোগ গ্রহণ করে। কিন্তু নাটকের মহলাস্থান পাওয়া কঠিন হয়ে পড়ে। সেই সময়ে রায়গঞ্জ ইনস্টিটিউট মঞ্চস্থ ছিল নাটক করবার একমাত্র মঞ্চ। এই মঞ্চেই সব নাটক মঞ্চস্থ হত। এই নাটক মঞ্চস্থ করাকে কেন্দ্র করে রায়গঞ্জ ইনস্টিটিউটের কর্মকর্তাদের সঙ্গে সংঘাত বাধে এবং তারা ঘোরতর আপত্তি জানায়। অবশেষে ইনস্টিটিউট কর্তৃপক্ষ এই শর্তে রাজি হল যে, দর্শকদের বসার জন্য ৮টা নতুন কাঠের সিটিং বেঞ্চ তৈরি করে দিতে হবে। এই শর্তে উক্ত যুবক গোষ্ঠীরা রাজি হয় এবং তারা নাটকের দিনে 'করোনেশন স্কুল থেকে কাঠের সিটিং বেঞ্চ ঘাড়ে করে বহন করে এনেছিলেন দর্শকদের বসার জন্য। উদ্যোক্তাদের মধ্যে সকলেই এই বেঞ্চগুলো আনয়নের ও পাঠানোর সুব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। তৎকালীন নাট্যজগতের প্রধান ও যশস্বীরা দর্শক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, তাঁরা হলেন— সতীশচন্দ্র গুপ্ত, ডা: যতীন দে, ডা: বৃন্দাবন চন্দ্র বাগচী, অধীর মুখার্জী, যুধিষ্ঠীর দাস, সুকুমার দত্ত, পরিতোষ সরকার, কালী নন্দী, জীতেন মজুমদার প্রমুখ। এইসব সংস্কৃতিমনস্ক নাট্যশিল্পীরা তখন রায়গঞ্জ ইন্সটিটিউটের কর্তৃপরায়ণ গোষ্ঠী থেকে নিজেরা বেড়িয়ে পড়েছিলেন। তাঁরা নব যুবকদের নাট্য প্রয়াসকে যথেষ্ট আগ্রহের সঙ্গে উৎসাহ দেখিয়েছিলেন। এবং এই নাট্যপ্রাজ্ঞদের সান্নিধ্য ও সহযোগিতা পাওয়ার মধ্য দিয়ে 'কাবুলিওয়ালা' দর্শকদের প্রশংসা অর্জন করেছিল। এরপর এই যুবগোষ্ঠী নাট্যসংস্থা গঠনের

সংকল্প নিয়ে রায়গঞ্জ করোনেশন স্কুলের ছাদে প্রথম সভার আয়োজন করে। এই সভায় উপস্থিত ছিলেন শুভাশীষ গুপ্ত, শক্তিচন্দ্র, সুধাংশু দে, মনোজ সরকার, মানিক সেন, স্বপন গুপ্ত, শিবশঙ্কর সেনগুপ্ত, সীতাংশু জ্যোতি দাস, প্রশান্ত দে, অরুণ হোড়, ভারতী গুপ্ত, গীতা ব্যানার্জী, মমতা ব্যানার্জী, বীথি দে প্রমুখ এবং এই সভাতেই সংস্থা গঠনের প্রথম সিদ্ধান্ত হয়। এর ফলে আনুষ্ঠানিকভাবে ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দের ১০ জানুয়ারি প্রগতিশীল সংস্কৃতিচর্চা, নাট্যাভিনয় ও সৃষ্টিশীল মানসিকতাকে বিকশিত করার লক্ষ্যে জন্ম হয় 'ছন্দম' নাট্যসংস্থার।

এই সংস্থা প্রতিষ্ঠালাভের পর থেকেই নতুন উৎসাহে মঞ্চস্থ করে 'রূপোলী চাঁদ', 'মেঘে ঢাকা তারা', 'কাঞ্চন রঙ্গ', 'রক্তকরবী', 'ছেঁড়াতার', ও 'নাট্যকারের সন্ধানে ছটি চরিত্র' প্রভৃতি নাটক। এই সব নাট্য-প্রযোজনা দর্শক সমাদর লাভ করে সু-উচ্চ প্রশংসা লাভ করে। এবং রায়গঞ্জের নাট্যপ্রেমী মানুষদের মন জয় করে নিয়েছিল। মোটকথা তখন পশ্চিম দিনাজপুরের নাট্যজগতে ছন্দম নাট্যসংস্থা একটি প্রতিষ্ঠিত নাট্যদলরূপে আত্মপ্রকাশ করে।

এই সংস্থা প্রতিষ্ঠা লাভের পর স্বাভাবিকভাবে 'ছেঁড়াতার' নাটক রিহার্সেলের প্রস্তুতি পর্বে ইন্সটিটিউট হলের কর্মকর্তাদের সঙ্গে সংঘাত বাধে এবং রিহার্সেল বন্ধ করে দেন। কারণ অনুসন্ধান করে জানা যায় যে, ইন্সটিটিউট কর্তৃপক্ষ ছন্দমের বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম ব্যবহারের ইচ্ছে প্রকাশ করে ব্যর্থ হয়েছেন। এরপর তারা বাধ্য হয়ে করোনেশন স্কুলের ছাদে রিহার্সেলের জন্য বেছে নেয় এবং ছেঁড়াতার নাটক ইন্সটিটিউট মঞ্চে মঞ্চস্থ করেই তারা মুক্তাঙ্গন মঞ্চ তৈরি করে নাটক করার সিদ্ধান্ত স্থির করেন। এরপর তারা স্কুল পাড়ার মুক্তাঙ্গন মঞ্চে প্রথম নাটক 'গেটম্যান' মঞ্চস্থ করে। দ্বিতীয় নাটক হিসেবে মঞ্চস্থ হয় 'ফেরারী ফৌজ'। এমনকি দিনেরপর দিন মুক্তাঙ্গন মঞ্চে স্কুলের বেঞ্চ নিয়ে এসে দর্শকদের বসানোর ব্যবস্থা করে নাট্যাভিনয় চলতে থাকে। এই স্কুল পাড়ার মুক্তাঙ্গন মঞ্চের পর স্ত্রীপল্লীর মুক্তাঙ্গন মঞ্চে ছন্দম নাট্যাভিনয়ের আয়োজন করে। এরপর তাদের তৃতীয় মুক্তাঙ্গন মঞ্চ স্থির হল রবীন্দ্রভবন প্রাঙ্গন। ছন্দম নাট্যসংস্থা রামেন্দ্রপল্লীর পূজাপ্রাঙ্গনকে নিরাপদ ও উপযোগী মনে করে তৈরী করে আর একটি মুক্তাঙ্গন মঞ্চ। শেষ পর্যন্ত নানাপ্রতিকূল অবস্থার মধ্য দিয়ে ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দের ১১ জানুয়ারি এই মুক্তাঙ্গন মঞ্চে 'নীলদর্পণ' অভিনীত হয়। এই নাট্যসংস্থা ক্রমশ নাট্যচর্চার মধ্য দিয়ে অভাবনীয় সম্মান ও প্রশংসা লাভে সমর্থ হয়ে ওঠে। ছন্দমের এই সুনাম ও কারও কারও কাছে ঈর্ষার কারণ হয়ে ওঠে এবং তারই ফলশ্রুতিতে তাদের বিভিন্নভাবে নিগৃহীত হতে হয়েছিল।

এইসব প্রতিকূল অবস্থাকে অতিক্রম করে নতুন ভাবনা নিয়ে তারা সামনের দিকে এগোতে থাকে। এবং যাযাবরের মতো না ঘুরে নিজস্ব মাথা গোঁজার মত ছোট আশ্রয় বা শান্তির ঠিকানা

খুঁজতে শুরু করে, যেখানে নিরাপদে নাটক করা যাবে। অনেক চিন্তা ভাবনার পর রামেন্দ্র পল্লীর সুধীর চক্রবর্তীর জমি স্থায়ী নাট্যমঞ্চের জন্য উপযুক্ত বিবেচনা করে উক্ত জমি ক্রয় হয়। এবং ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দের ১৬ ই জানুয়ারী। এই নাট্যসংস্থা আনুষ্ঠানিকভাবে স্থায়ী মঞ্চ (কাঁচা) ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। এরপর মঞ্চ তৈরির কাজ শুরু হয় এবং সংস্থার সদস্যদের পূর্ণ উদ্যমে ও সক্রিয় তৎপরতায় মঞ্চ নির্মিত হল। ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দের ২১ শে মার্চ বিশিষ্ট নাট্যপ্রেমী ও আইনজীবী সুকুমার গুহ মঞ্চের উদ্বোধন করেন এবং এই উদ্বোধনের পুণ্যলগ্নে তারা মঞ্চস্থ করেন সংস্থার নিজস্ব মঞ্চের প্রথম নাটক 'নীলদর্পণ'।[৫]

বিভিন্ন সংস্থা, অনেক সরকারি বেসরকারি সংস্থার আর্থিক আনুকূল্যে পূর্ণ ও সাধারণ মানুষের অকুণ্ঠ সহযোগিতায় গড়ে উঠেছে ছন্দমের স্থায়ী মঞ্চ।[৪]

৩. নজমু নাট্যনিকেতন, কালিয়াগঞ্জ, উত্তর দিনাজপুর: ১৯৩০ খ্রি:।

বিংশ শতকের তিন-এর দশকে কালিয়াগঞ্জ ছিল এক প্রত্যন্ত গ্রাম। এই থানা শহরে সামান্য কয়েক ঘর লোক বসবাস করেন। তখন থানার সঙ্গে পোস্ট অফিস, রেল স্টেশন আর শুধুমাত্র একটি দাতব্য চিকিৎসালয় ছিল। এই সময় কালিয়াগঞ্জে দুর্গাপূজা, কালীপূজাকে কেন্দ্র করে কিছু মৌখিক নাটক অভিনীত হয়। তৎকালীন সময়ে কালিয়াগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত দারোগা নজমুল হক সাহেব ছিলেন সংস্কৃতিমনস্ক ও নাট্যপ্রেমী। এবং এই সময়ে এখানকার এক বর্ধিষ্ণু পরিবারের তিন ভাই মাননীয় সুরেন্দ্রনাথ ভদ্র, মহেন্দ্রনাথ ভদ্র ও যোগেন্দ্রনাথ ভদ্র মহোদয়গণ যথেষ্ট সংস্কৃতিপ্রেমী, উদার ও প্রগতিশীল মানসিকতায় সমৃদ্ধ গণ্যমান্য ব্যক্তি ছিলেন। তাই দেখা যায়, এই সময়ে এ থানার ভারপ্রাপ্ত দারোগা সাহেব নজমুল হক সাহেবের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এবং উক্ত ভদ্র ভ্রাতৃগণের নিঃস্বার্থ দানে প্রদান করা জমির উপর গড়ে ওঠে 'নজমু নাট্যনিকেতন'। প্রথম পর্বে নজমুল হক সাহেবের নাম মনে রেখেই নামকরণ হয়েছিল তবে বিশেষ সূত্রে জানা যায় যে, তিন ভদ্র ভ্রাতৃগণের অনুমতিক্রমে ২৯.০৬.৫৩ তারিখে ৮২১০ নং দলিলে এই প্রতিষ্ঠানের নাম 'কৈলাস নিকেতন' নামে রেজিস্ট্রি হয় এবং পরবর্তীতে ১২.১২.৫৫ তারিখে ৪০৩২ নং দলিলে উক্ত প্রতিষ্ঠানের নাম 'কৈলাস নাট্যনিকেতন' নাম বাতিল করে 'নজমু নাট্যনিকেতন' নামকরণ করা হয়। তবে জমিদাতা ভদ্র ভ্রাতৃগণের একটি শর্ত ছিল যে, বিনোদনের ধারা অক্ষুণ্ণ রাখতে হবে নতুবা এই জমির পুনরায় ভ্রাতৃগণের হস্তগত হবে।

এই প্রতিষ্ঠানের হয়ে সেই সময়কালের সম্পাদক কালীপ্রসন্ন চক্রবর্তী জমির দান গ্রহণ করেন এবং নজমু হক সাহেবের সক্রিয় উদ্যোগে, তৎপরতায় এবং সংস্কৃতি পিপাসু ব্যক্তিবর্গের প্রচেষ্টায় বেশ কিছু শালের খুঁটি ও টি সংগ্রহ করে অস্থায়ী ছাউনি দিয়ে প্রেক্ষাগৃহ নির্মিত হয়। নাটক

মঞ্চস্থ হওয়ার সময় চারিদিকে চটের বেস্টনী দিয়ে প্রেক্ষাগৃহ ঢাকার ব্যবস্থা করা হত এবং দর্শকের বসার জন্য মাটিতে ত্রিপাল পাতানোর ব্যবস্থা ছিল। এবং এই প্রেক্ষাগৃহ ছিল উত্তর-দক্ষিণে লম্বা। পরবর্তীতে এই এতদঞ্চলের অসংখ্য মানুষের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ আত্মত্যাগ ও নিরলস পরিশ্রমে এবং পঁচিশো এগারো আসন সম্বলিত হয়ে এই নাট্যসংস্থা পাকা স্থায়ী মঞ্চ নির্মিত হয়। এই নাট্যমঞ্চ কালিয়াগঞ্জের অধিবাসী বৃন্দের সংস্কৃতি পিপাসু মনের তৃষ্ণা নিবারণ করে চলেছে। এমনকি নাট্যাভিনয়ে পাশাপাশি বিভিন্ন সময়ে নাচ-গান এবং মনোগ্রাহী প্রাসঙ্গিক সেমিনার প্রভৃতি সাংস্কৃতিক চর্চার পরিপূর্ণতা দানে এই নাট্যমঞ্চ আজও সক্রিয় ও চলমান হয়ে রয়েছে।

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার নাট্যমঞ্চে রূপরেখা:

বালুরঘাট নাট্যমন্দির, বালুরঘাট, দক্ষিণ দিনাজপুর : ১৯০৯ খ্রি:।

ব্রিটিশ শাসনকালে ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে স্থানীয় জমিদার-তথা জোতদারদের দাবীতে বালুরঘাটে সরকার মামলা মোকদ্দমা করার জন্য একটি মুন্সেফি চৌকি স্থাপন করেন। ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে বালুরঘাট মহকুমা শহর হিসাবে ঘোষিত হওয়ার ফলে পতিরাম থেকে থানা সরিয়ে আনা হয় বালুরঘাটে। মহকুমা শহর হওয়ায় ধীরে ধীরে প্রশাসনিক কাজকর্ম নির্বাহের জন্য সরকারী প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। আত্রেয়ী নদীর পূর্বতীরে মহকুমা গড়ে ওঠার ফলে রাজশাহী, দিনাজপুর, বগুড়া, ঢাকা, ময়মনসিংহ, পাবনা, বরিশাল, যশোর প্রভৃতি জেলার অধিবাসীরা এখানে আসতে থাকেন। সেই সময় এখানে আনন্দ অনুষ্ঠানে কীর্ত্তন, যাত্রাগান, কবিগান, খেমটা গানের আসর বসত। সেই সঙ্গে কোন কোন স্থানে স্টেজ বেঁধে নাটক অভিনয়ও হত।

মোটকথা বালুরঘাট মহকুমা শহর হিসেবে পরিণত হওয়ার পর উকিল রাধাচরণ ভট্টাচার্য, উমেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, চিন্তাহরণ মুখোপাধ্যায়, শশাঙ্ক শেখর রায়, বিভূতিভূষণ সান্যাল, আশুতোষ ঘোষ, ব্রজেন বসু, নলিনীকান্ত বাগচী, মতিলাল মুখোপাধ্যায় প্রমুখ বিশিষ্ট সংস্কৃতিমনস্ক ভদ্রমহোদয়গণ শুধুমাত্র বিনোদন ও সুস্থ সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল গড়ে তোলার জন্য এই প্রত্যন্ত গ্রামীণ মহকুমা শহুরে— স্টেজ বেঁধে নাটক করার প্রয়াসী হন এবং সংস্কৃতি চর্চার জন্য কোন প্রেক্ষাগৃহ না থাকায় বিভিন্নভাবে অসুবিধা হওয়ার ফলে সকলে সমবেত হয়ে স্থায়ী নাট্যমঞ্চ স্থাপনের উদ্দেশ্যে স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এর ফলে ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে সকলে সম্মিলিতভাবে বালুরঘাট থিয়েট্রিক্যাল 'এসোসিয়েশন' নামে একটি সমিতি গঠন করেন। এই সমিতির প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক হলেন রাধাচরণ ভট্টাচার্য, প্রতিষ্ঠাতা সহ সম্পাদক হলেন শশাঙ্ক শেখর রায়, সহকারী স্টেজ ম্যানেজার হলেন বিভূতিভূষণ সান্যাল, স্টেশনমাস্টার হলেন আশুতোষ ঘোষ বিজনেস ম্যানেজার হলেন ব্রজেন্দ্র

বসু আর অনেকেই সভ্য ছিলেন। সমিতি তৈরী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নাট্যাভিনয়ের উন্মাদনা শুরু হয় এবং প্রচুর নাট্যশিল্পীর আবির্ভাব হওয়ার ফলে নাটক মঞ্চস্থ করবার প্রেক্ষাগৃহ ও মহল্লা দেওয়ার স্থানের অভাব প্রবল ভাবে সকলকে উদ্বেলিত করে তুলেছিল।

১৯১০ খ্রিস্টাব্দে সুরেশ চন্দ্র সেন মহকুমা হাকিম হয়ে বালুরঘাটে আসেন। তাঁর সঙ্গে এলেন তাঁরই শ্যালক শশাঙ্কশেখর রায়, তিনি কনট্রাক্টারি করার জন্য জায়গা ক্রয় করে বর্তমান 'সুরেশরঞ্জন পার্ক' এর নিটকে একটি ইঁট ভাটা খুলে ব্যবসা শুরু করেন। তিনি নাট্যমন্দির তৈরীর জন্যে সমিতিকে এক বিঘা জমি দান করেন। উক্ত জমিতে ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দের ২৭শে ডিসেম্বর নাট্যমন্দিরের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপিত হয়। এই ভিত্তি প্রস্তর স্থাপিত হওয়ার ফলে তৎকালীন বালুরঘাটের অধিবাসী বৃন্দের ঐকান্তিকতা, উৎসাহ-উদ্দীপনা, অকৃত্রিম অধ্যবসায় এবং সমবেত প্রচেষ্টায় অর্থ সংগৃহীত হয় এবং সক্রিয় তৎপরতার সঙ্গে প্রেক্ষাগৃহ নির্মাণের কাজ শুরু হয়। এই সময়ে রাজা সপ্তম এডোয়ার্ডের সিংহাসন আরোহনকে কেন্দ্র করে উৎসকের জন্য সংগৃহীত চাঁদার অর্থে এই সংস্থার মঞ্চ নির্মিত হয়েছিল। সেই সঙ্গে ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে এই সংস্থাটির নাম পরিবর্তন করে 'দা এডওয়ার্ড (মেমোরিয়াল ড্রামাটিক ক্লাব' নামকরণ করা হয়। মোটকথা, ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দের ২৪শে মার্চ এই নাট্যসংস্থার স্টেজ ও প্রেক্ষাগৃহ তৈরীর জন্য প্রথম প্রস্তাব মঞ্জুর হয় এবং ১৯২০ খ্রিস্টাব্দের ১৭ মে সংস্থার প্রেক্ষাগৃহ নির্মাণের কাজ সম্পন্ন হয় এবং কৎকালীন দিনাজপুর জেলার কালেক্টর মি. আর ব্রুমফিল্ড 'দা এডওয়ার্ড মেমেরারিয়াল ড্রামাটিক ক্লাব' হলের উদ্বোধন করেন। অবিভক্ত দিনাজপুরের সুমহান নাট্যঐতিহ্যের প্রকৃত ধারক ও বাহক হয়ে বালুরঘাট নাট্যমন্দির বালুরঘাটে মহকুমা তথা সমগ্র পশ্চিম দিনাজপুরের নাট্যচর্চার একমাত্র কেন্দ্র হিসাবে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে আজও স্বমহিমায় বিরাজমান। বালুর ঘাটের স্থায়ী নাট্যমঞ্চ নাট্যসমাজ প্রতিষ্ঠার বিষয়ে জানা যায় প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক মাননীয় শ্রীরাধাচরণ ভট্টচার্য মহাশয়ের রিপোর্টে—

Report Read at the Opening Ceremony of the Edward Memorial Dramatic Hall (New Premises) on the 29th October, 1914. (Opened by J.A. Ezecchiel Esqr. I.C.S., District Magistrate, Dinajpur)

REPORT

Mr. Chairman and Gentlemen,

The origin of this institution may be treated as early as the year 1909. Balurghat is a dull and unhealthy place and though the Sub-divisional Headquertes were opened here in 1904 there is no kind of diversion which the people might take recourse to after day's hard work in office was over. To break the monotony of the place, in the year 1909 some of the present members of the Club with the help of some local people for med a theatrical party which might provide for giving pure and innocent amusement to the people. Babu Atul Chandra Dutta was our Sub-divisional Officer at the time, and though he had full sympathy with the project the party did not make much progress during his time.

Generally the party began to attract the notice of the general public of Balurghat and during the time of our late Sub-divisional Officer, Babu Suresh Chandra Sen, who was one of it's patrons and who took, so long as he was here, deep and kind interest in its welfare and tried to advance its cause in every possible way the Institution made rapid and satisfactory progress in all possible directions. It was in his time that when the Divisional Commissioner F.J. Monaham Esqr. I.C.S. and the District Magistrate F.W. Strong Esqr. I.C.S. came here in their winter inspection tour, the party staged and entertained them with the performance of play Hariraj and it will not be out of place to mention here that both of them appreciated the play and expressed their satisfaction at it.

In February, 1912 this party gave an entertainment to our former District Magistrate Mr. Lambadue who expressed his written opinion in the following terms—" I had the pleasure of witnessing performance of Hariraj by the

Balurghat amature theatrical party and can say I enjoyed it very much and was much impressed by the staging and acting of the play on 22.2.12."

This club had the good fortune of giving entertainment to our kindhearted District Magistrate and the Supdt. Of Police, who are present here to-day on occasion previous to this and we have not yet been able to know from them as to how the party acquinted themselves on these occasions.

At the time of the Coronation Darbar Celebration of our presents King Emperor in the year 1911 last the party was asked to give entertainment to the people and the party did its part as well that the officials and non officials alike were very much pleased with that they said and expressed their appreciation in high and eulogistic terms. It was at that time that the party took its name as "The Edward Memorial Dramatic Club" with the object of commemorating the memory of our late beloved Kind Edward VIII.

A few months after the coronation Ceremony was over it was though necessary that the Club should be brought to a more permanent and sounder basis and with that object in view, a meeting of the Balurghat gentry and general public was held in which an executive Committee was formed with Babu Nalini Kanta Adhikary, B.L. as its President, my humble self as its Secretary, Babu Umesh Chandra Banerji, Muktear as Asst Secretary and Sasanka Shekhar Roy as its Manager. The club also got amongst others Babu Rajendra Nath Sanyal & Maharaj Bahadur Sing Zamindar of the Sankarpur Estate as its patrons. Some rules and regulations were framed at the time for the guidance of the members of the club and strict discipline was enjoined always to be kept among the players.

While the institution was going on in this way for some time Babu Nalini Kanta Adhikary tendered his resignation. Moulavi Abdul Mozaffar Ahmed, B.L. our present Subdivisional Officer, was unanimously elected

President in his place it was through his untiring action and energetic creation that the club has arrived at its present state of permanency.

Through the club had been in existence from 1909 it had always been suffering from many difficulties and various disadvantages for want of building of its own; at when it was high time that the party should have a permanent stage and the members failed to secure a suitable site for the purpose Babu Sasanka Shekhar Roy, Manager of this Club, offered to make a free gift of a piece of land or the construction of a permanent house for the Club. The Committee at once accepted this generous offer with thanks, expressed its gratefulness to him and decided to constructed a building upon it.

This Club was so long maintained by public donations and subscriptions realised from its members and though the regular expenditure could have been barely met from the money thus received; no surplus was left of that money for any other purpose. So after the free gift of the land we got, the present building was constructed with money obtained by taking a loan of Rs. 500/-. The present building which our popular and generous District Magistrate has Kindly consented to open to-day will cost about Rs. 10,000/- with the stage and other necessary equipments. But of this about Rs. 4000/- have been received by collection from donations; of the remaining Rs. 6000/- the club has liability to the extent of about Rs. 3000/- by way of loan and unpaid price of material which requires to be cleared very soon.

Our energetic and Kindhearted Sudivisional Officer wants to make this instruction a complete success and it trying all possible means to realise money for this purpose; and if he goes on working in this way and if the generous public extend their helping hand and contribute liberally to the fund we have no doubt that the money required will be easily realised and our debts will very soon be cleared and the stage with all its requirements will be complete before the end of this year.

The committee does not find sufficient words to express its appreciation of the fatherly interest which our present Subdivisional Officer is taking for the success of this institution without which is would have been impossible for the Committee to go on with the work they took in hand, and for this the club shall always remain grateful to him. And as a mark of true appreciation of the services rendered by him to this institution the committee with the help of the members of Dramatic Club has made an oil painting of our President Moulavi Abdul Mozaffar Ahmed ready to be kept in the hall which, I have the pleasure to ask you, Mr. President, to unveil to-day. The Committee prays that our present Subdivisional Officer, before he goes away, will kindly see his way, and if necessary, in consultation with our sympathetic Magistrate, to leave the Institution in a more sound financial condition.

The committee also expresses its appreciation of the services rendered by the members who did the work of coolies by carrying brick from the brick filed and helped the construction of the building by doing other menial works. The names of Babus Matilal Mukhejee and Umesh Chandra Banerjee may specially be mentioned as they also helped the President in collecting subscriptions for the purpose.

The Committee is grateful to Babu Rajendra Nath Sanyal, Zaminder and his co-sharers for allowing the theatrical party to use their old dispensary building free of charge, for a pretty long time.

The thanks of the Committee are also due to our D.B. Overseer and P.W.D. & L.B. Overseers and also to the P.W.D. Sub-divisional Officer Babu Sris Chandra Bhattacharjee and District Engineer of Dinajpur who helped us with their professional advice in course of the construction of this building.

With these few words I request our Kindhearted and sympathetic District Magistrate to declare the Edward Memorial Dramatic Club Hall open

and to unveil the oil painting and express on behalf of the Committee our gratefulness to him for the troubles be had taken in coming here all the way from Dinajpur to perform this Ceremony.

Sd/- R.C. Bhattacharjee

Secretary

29.10.14

উপরে উক্ত রিপোর্টে উল্লিখিত 'The Edward Memorial Dramatic Claub'-ই বর্তমানে বালুরঘাট নাট্যমন্দির নামে পরিচিত লাভ করে। যতদূর জানা যায় উক্ত এই নাট্যসংস্থার সম্পাদক নরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। সম্পাদক থাকাকালীন অবস্থায় ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে ১১ই আগস্ট সংবিধান সংশোধন করে নামকরণ হয় 'বালুরঘাট' নাট্যমন্দির।[৬]

গোবিন্দ অঙ্গন, কল্যাণমঞ্চ, বালুরঘাট, দক্ষিণ দিনাজপুর: ১৮.০৪.১৯৭৬

বালুরঘাট মহকুমার বিশ শতকের সাত-এর দশকের অন্যতম ও উল্লেখযোগ্য নাট্যসংস্থা হল 'ত্রিতীর্থ' যা সমগ্র বাংলাজুড়ে আজও সুখ্যাতি ও প্রশংসা লাভ করে স্বমহিমায় নাট্যচর্চার জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করে ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দের মে জুন নাগাদ বালুরঘাটের দুটি ছোট নাট্যসংস্থা 'ত্রিশূল'ও একত্রিত হয়ে নাটকের তীর্থভূমি বালুরঘাটের একটি সংহত নাট্যদল তৈরী করে আধুনিক নাট্য-প্রযোজনার সংকল্প গ্রহণ করেন এবং তা বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য স্থানীয় টাউন ক্লাব ঘরে তরুণতীর্থ, ত্রিশূল এবং বালুরঘাট নাট্যমন্দিরের কিছু সদস্য সমবেত ভাবে আলোচনায় বসেন। উক্ত আলোচনার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রভাস সমাজদারের বাড়িতে ১৯৬৯ খ্রিব্দাব্দের ২৬শে আগস্ট নতুন নাট্যসংস্থা রূপে 'ত্রিতীর্থ' আত্মপ্রকাশ করে।

১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দের ২৬ শে সেপ্টেম্বর সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ঠিক এক মাসের মাথায় বালুরঘাট নাট্যমন্দির মঞ্চে 'পুতুলখেলা' নাটকের মহড়া শুরু হয়। এবং নাটকটি বালুরঘাট নাট্যমন্দির মঞ্চে মঞ্চস্থ করার জন্য মঞ্চভাড়া করা হয় কিন্তু অস্বাভাবিক বৃষ্টিপাত ও বন্যার জন্য নাট্যমন্দির প্রেক্ষাগৃহ জলমগ্ন হয়। সেই কারণে প্রস্তুতি নিয়েও নাটকটি নির্দিষ্ট দিনে মঞ্চস্থ করা সম্ভব হয়নি। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে তখন পতিরামের জমিদার ধীরেন ঘোষের প্রস্তাব অনুযায়ী তাদের চক্ভবানীর পৈতৃক সম্পত্তির একটি খোলামাঠে (বর্তমানে যেখানে মিউনিসিপ্যালিটির মার্কেট বা ব্যাঙ্কের বামার) সংস্থার সকলে সমবেত হয়ে অতি দ্রুত সক্রিয় ও তৎপর হয়ে অক্লান্ত নজিরবিহীন পরিশ্রম এবং সেই সঙ্গে সন্নিহিত গ্রাম সহ যারা বালুরঘাটের নাট্যামোদী ও সংস্কৃতি চেতনায় ঋদ্ধ

বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের অপ্রত্যাশিত সহযোগিতায় কয়েক মাসের মধ্যেই সেই জমির উপর ৩০০ অসন বিশিষ্ট একটি অস্থায়ী মঞ্চ গড়ে উঠেছিল। এই প্রেক্ষাগৃহের নামকরণ হয় স্বর্গত গোবিন্দ ঘোষ মহাশয়ের নামে গোবিন্দ অঙ্গন। এবং তাঁর প্রয়াত পুত্র সংস্থার সুহৃদ ও অভিনেতা তথা শিক্ষাবিদ কল্যাণ ঘোষের নামে 'কল্যাণমঞ্চ'। এই মঞ্চ নির্মাণের মহৎ যজ্ঞে সংস্থার যে নিষ্ঠা, পরিশ্রম, একান্তিকতা ও সর্বোপরি সংঘবদ্ধ নাট্যপ্রেমী মানুষেরা অদম্য ইচ্ছাশক্তি ও অপরাজেয় মানুষের পরিচয় দিয়েছেন, তা বালুরঘাট তথা জেলার নাট্যচর্চার ইতিহাসে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রূপে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। এই মঞ্চ নির্মাণের প্রসঙ্গে ত্রিতীর্থ সংস্থার কর্ণধার তথা জেলার অন্যতম খ্যাতনামা নাট্যকার হরিমাধব মুখোপাধ্যায়ের মূল্যবান মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য—

''মনে পড়ছে গ্রামে গ্রামে ঘুরে বাঁশ সংগ্রহের অভিযান— বোয়ালদাড় আমাদের সাহায্যার্থে অমিয় সরকারের পদযাত্রা-নদীতে বাঁশের ভেলা ভাসিয়ে আনা কাপড়ের দোকানে ঘুরে ঘুরে চটের টুকরো সংগ্রহ— সাইকেলের ক্যারিয়ারে পতিরাম থেকে ছানাদার চটের বস্তা বয়ে নিয়ে আসা মাঠে বসে সবাই মিলে সেই টুকরো ছেঁড়া চট সেলাই করে বহুবর্ণে বিভক্ত অবিশ্বাস্য বড় মাপের ট্রান্সপারেন্ট একটি সামিয়ানার এপোলজি তৈরী করা— যার ফাঁক দিয়ে চাঁদের জ্যোৎস্না, শিশির বিন্দু, বৃষ্টির ফোঁটা দর্শকদের মাথার উপর অকৃপণভাবে ঝড়ে পড়ত। বিনা প্রতিবাদে দর্শকরা আমাদের দারিদ্র অসামর্থ মেনে নিত।''

শনি ও রবি এই দুই দিন অভিনয়ের জন্য ধার্য ছিল। কিন্তু অস্থায়ী মঞ্চ নির্মিত হলেও দর্শকাসনের ব্যবস্থা না হওয়ায় সংস্থার সদস্যদের তৎপরতায় এবং সর্বোপরি ললিতমোহন আদর্শ উচ্চবিদ্যালয়ের তদানীন্তন নাট্যপ্রেমী শিক্ষক সুধীরচন্দ্র তলাপাত্র শনিবার বেলা একটার মধ্যে বিদ্যালয় ছুটি ঘোষণা করে প্রয়োজনীয় বেঞ্চ দিয়ে ত্রিতীর্থের দর্শকাসনের ব্যবস্থা করে সমস্যার সমাধান করেছিলেন। রবিবার নাটক শেষ হবারপর সেই বেঞ্চগুলো যথাসময়ে বিদ্যালয়ে পৌঁছে দিতে হত।

এই সংস্থার পাকা মঞ্চ নির্মাণের সার্বিক দায়িত্ব পালন করেছিলেন অবিনাশ দত্ত ও প্রভাস সমাজদার। নানা প্রতিকূল পরিস্থিতির সঙ্গে গভীর নিষ্ঠা ও অগাধ পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে রসদ সংগ্রহ করে স্থানীয় মিস্ত্রি ও কারিগরদের সাহায্যে গড়ে উঠেছিল ত্রিতীর্থের নিজস্ব পাকা ও প্রেক্ষাগৃহ সহ রঙ্গমঞ্চ। এবং সংস্থার অন্যতম সদস্য তথা নাট্যকার শুভ্রাংশুশেখর মৈত্রের 'বন্দী সম্রাট' নাটক (১৮.৪.১৯৭৬) অভিনয়ের মাধ্যমে এই সংস্থার স্থায়ী নাট্যমঞ্চের উদ্বোধন হয়। এই স্থায়ী মঞ্চে সযত্নে আধুনিক পরীক্ষা-নিরীক্ষামূলক যুগোপযোগী ও যথার্থ প্রাসঙ্গিক নাট্যাভিনয়ের মধ্য দিয়ে এই সংস্থা জেলা সহ উত্তরবঙ্গ তথা সমগ্র বাংলার নাট্যজগতে বেশ আলোড়ন সৃষ্টি করে জেলার

নাট্যচর্চাকে সগৌরবে সুউচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত করেছেন এবং অদ্যাবধি নাট্যাভিনয় করে জেলার নাট্যচর্চাকে সমৃদ্ধ করে চলেছেন।

নাট্যতীর্থ মন্মথমঞ্চ, বালুরঘাট, দক্ষিণ দিনাজপুর: ১৭.১০.২০১১।

বালুরঘাট মহকুমায় বিশ শতকের আট এর দশকে মূলত বালুরঘাট নাট্যমন্দির ত্যাগ করে কয়েকজন দক্ষ অভিনেতার যৌথ প্রয়াসে নাট্যতীর্থের জন্ম হয়। ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দের ১৭ই অক্টোবর বালুরঘাট নাট্যমন্দিরের একনিষ্ঠ সংগঠক ও অভিনেতা তথা বালুরঘাট কলেজের দর্শনের অধ্যাপক প্রণব চক্রবর্তীর প্রধান উদ্যোগে পাঁচজন মহিলা সহ মোট তিরিশজন সদস্য তথা নাট্যশিল্পীদের নিয়ে নাট্যতীর্থ পথচলা শুরু করে। মোটকথা তৎকালীন সময়ের বিভিন্ন নাট্যসংস্থার অসখী নাট্যঅভিনেতারা একত্রিত হয়ে এই নাট্যসংস্থা গড়ে তোলেন। নাট্যতীর্থ প্রথম পর্বে অস্থায়ী শুধু নয় বরং ভ্রাম্যমান অবস্থায় বিভিন্ন নাট্যশিল্পীর ভালোবাসায় নানাস্থানে নাটকের মহড়া দিয়ে চলতে শুরু করেছিল গুণমানে উন্নত নাট্যচর্চার আশায় এই সংস্থা প্রথমে নদীর ওপারে চকভৃগুতে এবং পরবর্তীতে স্বাধীনতা সংগ্রামী ও বালুরঘাট উচ্চ বিদ্যালয়ের ইংরেজি শিক্ষক ও নাট্যাভিনেতা শ্রী পুলিনবিহারী দাশগুপ্তের সহযোগিতায়— শিবমন্দির সংলগ্ন জমিতে দরমার বেড়া দিয়ে ঘর তৈরি করে নাটকের মহড়া দেওয়া শুরু হয়। অর্থাৎ তিনি নাট্যতীর্থকে শিবমন্দিরের চারচালাটিকে সংস্থার নাট্যচর্চার জন্য ছেড়ে দিয়েছিলেন তাই সেখানে সংস্থার সদস্যরা সক্রিয় প্রচেষ্টায় কোন রকমে বাঁশের বেড়া দিয়ে অস্থায়ী মহলাকক্ষ নির্মাণ করে দু বছর ধরে নিষ্ঠার সঙ্গে নাট্যচর্চা অব্যাহত রাখেন।

পরবর্তীকালে নাট্যতীর্থে রবীন্দ্রভবনের সন্নিহিত উত্তরদিকে ২৫টাকা খাজনার বিনিময়ে ৫কাটা জমি লিজে পায় এবং উক্ত সরকারী জমির উপর স্থায়ী মঞ্চ নির্মাণের উদ্দেশ্যে ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন জেলার বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব তথা এই সংস্থার সভাপতি দেবল রায়। মোটকথা সরকারী পঞ্জীভূত এই নাট্যসংস্থার সদস্যদের উদ্যোগে উক্ত ৫ কাটা সরকারী জায়গায় সরকারী আর্থিক সহযোগিতায় সাড়ে চারশত আসন বিশিষ্ট একটি প্রেক্ষাগৃহ ও মঞ্চ তৈরী করেন এবং এই মঞ্চের মন্মথ মঞ্চ নামকরণ হয়। অবশেষে ২০১১ খ্রিস্টাব্দের ১৭ই অক্টোবর এই সংস্থা তার জন্মলগ্নে শীততাপ নিয়ন্ত্রিত প্রেক্ষাগৃহ ও মন্মথ মঞ্চের শুভ উদ্বোধন করেন জেলার নাট্যপ্রেমী তথা প্রাক্তন মন্ত্রী মাননীয় শ্রী বিশ্বনাথ চৌধুরী মহাশয়। এখানে প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, সমস্ত বাংলা জুড়ে একমাত্র নাট্যসংস্থা নাট্যতীর্থ, নাট্যকার মন্মথ রায়ের স্মৃতি বিজড়িত বালুরঘাটে তাঁর জন্মশতবর্ষে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে মঞ্চটিকে 'মন্মথ মঞ্চ' নামে চিহ্নিত করে এই নাট্যসংস্থা জেলা তথা বাংলায় যথেষ্ট সুনাম ও খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। এই নাট্যসংস্থা প্রতিষ্ঠার লগ্ন থেকে সম্প্রতি নাট্যাভিনয়ের মধ্য দিয়ে জেলার ঐতিহ্যবাহী নাট্যচর্চার ধারাবাহিকতাকে বজায় রেখে জেলার নাট্যচর্চাকে সমৃদ্ধ করে

যথেষ্ট প্রশংসনীয় ও কৃতিত্বের অধিকারী হয়ে সমগ্র বাংলা ব্যাপী বিস্তার লাভ করেছেন।

বোয়ালদাড় বারোয়ারী নাট্যসংস্থা, বালুরঘাট, দক্ষিণ দিনাজপুর:

অবিভক্ত দিনাজপুর জেলার মহকুমা শহর বালুরঘাট থেকে ছয় কিলোমিটার দূরত্বে আত্রাই নদীর পশ্চিমপাড়ে বোয়ালদাড় গ্রাম। এখানকার উন্নতসংস্কৃতি মনস্ক মানুষেরা চল্লিশের দশকে সুদূর প্রসারী ভাবনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সকলে সমবেত হয়ে আলোচনা করে গ্রামে নাট্যসংস্থা গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। এবং নিয়মিতভাবে নাটক— যাত্রাপালা অনুষ্ঠিত হবে বলে সর্বসম্মতিক্রমে গ্রামের বারোয়ারীতলায় নিজেদের নিষ্ঠা, সাধনা পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে স্বাভাবিক ছন্দে প্রাথমিক পর্বের কাজ শুরু করে দিলেন। এর ফলে সকলের উৎসাহ ও উদ্দীপনায় কয়েক মাসের মধ্যেই গড়ে উঠল মাটির তৈরী বিশালকৃতির খড়ের ছাউনি দেওয়া নতুন নাট্যমঞ্চ। এবং এই অস্থায়ী নাট্যমঞ্চে গ্রামের সকলে আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে প্রথম নাট্যাভিনয় শুরু করেন। এর ফলে গ্রামের সংস্কৃতি প্রিয় সকলের মধ্যে বেশ আলোড়ণ জেগে ওঠে। আরও কিছু করার প্রেরণায় তারা অগ্রসর হতে থাকে। শহুরে সংস্কৃতির পরশ থেকে দূরে গ্রামে থেকে যাঁরা এই মফস্বল বোয়ালদাড় এই কর্ম কাণ্ডের মূখ্য ভূমিকায় উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য নাট্যামোদী ও সংস্কৃতি প্রেমী ব্যক্তিরা হলেন উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, জানকী বল্লভ চৌধুরী, জ্যোতিষচন্দ্র গোস্বামী, নিমাইচরণ শীল, অমূল্যচরণ সরকার, জীতেন ব্যানার্জী, সজনীকান্ত রায় প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ ও তাঁদের অনুজ নতুন প্রজন্মের আরও অনেকে।

এরপর ১৯৯৫ থেকে ১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দে গ্রামের বারোয়ারী মণ্ডপের বারান্দায় সকলে উপস্থিত হয়ে আলোচনা সভা বসে। এই আলোচনায় অস্থায়ী মঞ্চের বদলে স্থায়ী মঞ্চ নির্মাণের পরিকল্পনা গৃহীত হয়। স্থির হল একটি স্থায়ী (পাকা) খোলামঞ্চ নির্মাণ করা। এবং একটি কমিটি গঠন করা হয়, যার আহ্বায়ক হলেন অমিত সরকা। এছাড়াও এই ৭-৮ জন নিয়ে একটি টিম গঠিত হয়। বিশিষ্ট নাট্যপ্রেমী ও সংস্কৃতিপ্রিয় অমিত সরকারের নেতৃত্বে গ্রামের নবতরুণেরা উদ্বুদ্ধ হয়ে নাট্যসংস্থার মঞ্চ নির্মাণের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েন। এই বোয়ালদাড় গ্রামের বাসন্তীপূজা, যাত্রাগানের পার্শ্বস্থ অঞ্চললে সুনামের সঙ্গে ভীষণ প্রচার থাকায় মঞ্চ নির্মাণের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সংগ্রহ হয় এবং ১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে জেলার স্বনামধন্য নট-নাট্যকার ও কাছের মানুষ শ্রদ্ধাভাজন হরিমাধব মুখোপাধ্যায়কে দিয়ে তারা মঞ্চের শিলান্যাস করান। এরপর সকলে অক্লান্ত পরিশ্রম ও সমবেত প্রচেষ্টায় সংগৃহীত সামগ্রী, নিজেদের বুকভরা ভালোবাসা থেকে প্রদত্ত অর্থ ও সরকারী আর্থিক সহায়তায় স্থায়ী মঞ্চ নির্মিত হয়। ২০০৪ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে বোয়ালদাড় বারোয়ারী নাট্যসংস্থা বহু প্রত্যাশিত নবনির্মিত স্থায়ী নাট্যমঞ্চ সহ সাজঘর (গ্রীনরুম)-এর উদ্বোধনী হয় এক

বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে। তাই এই উদ্বোধন উপলক্ষে চার-পাঁচ দিন ধরে বিভিন্ন আকর্ষণীয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গে নাটক ও যাত্রার আয়োজন হয় এবং প্রচুর দর্শক সমাগম হয়। এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট সম্মানীয় ব্যক্তি বর্গেরা উপস্থিত ছিলেন। সেই সঙ্গে ছিলেন বহু বিশিষ্ট নাট্যকর্মী, নাট্যব্যক্তিত্ব ও জেলার তথা উত্তরবঙ্গের খ্যাতনামা 'নট-নাট্যকার হরিমাধব মুখোপাধ্যায়। এই নাট্যসংস্থা ২০১১ খ্রিস্টাব্দে পরিপূর্ণ নাট্যমঞ্চে ঐতিহাসিক ৭০ বছর পূর্তি উৎসব পালন করে নাট্যচর্চায় আজও সক্রিয়ভাবে ক্রিয়াশীল।

ঐতিহ্যময় নাট্যচর্চার প্রবাহের ধারায় সৃষ্ট নাট্যমঞ্চকে কেন্দ্র করে নাট্যব্যক্তিত্বের আবির্ভাব (নট-নাট্যকার, নাট্য-অভিনেতা, নাট্য-অভিনেত্রী, নাট্য-পরিচালক, নাট্য-নির্দেশক, প্রযোজক/পরিচালক, নাট্যকর্মী)

উত্তর দিনাজপুর জেলার অন্যতম ও খ্যাতি সম্পন্ন বিশিষ্ট সংস্কৃতিমনস্ক নাট্যব্যক্তিত্বের পরিচয়:

উত্তর দিনাজপুর জেলার নাট্যচর্চায় রায়গঞ্জ ইনস্টিটিউটের অবদান সর্বপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ও গুরুত্বপূর্ণ। এই জেলার নাট্যচর্চার শুরুর লগ্ন থেকে রায়গঞ্জ ইনস্টিটিউট অসাধারণ সাফল্যের সঙ্গে নাট্যচর্চা তথা নাট্যাভিনয় করে এ জেলাসহ উত্তরবঙ্গ তথা সমগ্র বাংলাজুড়ে সু-উচ্চ প্রশংসা লাভ করে অপরিকল্পনীয় কৃতিত্বের অধিকারী হয়ে উঠেছিল। তাই মন্মথ রায় পশ্চিম বাঙ্গাল সাধারণ নাট্যশালা শতবর্ষপূর্তি উৎসব সমিতির কার্যকরী সভাপতি হয়ে ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে ২৩-২৫ শে মার্চ রায়গঞ্জে এসে তিনি রায়গঞ্জ ইনস্টিটিউট সম্বন্ধে একটি মূল্যবান মন্তব্য করে বলেছেন— ''রায়গঞ্জ ইনস্টিটিউট...এর নাট্যকৃতিত্ব দেখেও মুগ্ধ হতে হয়।'' মোটকথা উত্তর দিনাজপুর জেলায় ক্রমবর্ধমান নাট্যচর্চা ও নাট্যআন্দোলনের হাত ধরে অনেক শক্তিশালী নাট্য-অভিনেতা-অভিনেত্রী, নট-নাট্যকার, নাট্য-নির্দেশক বা পরিচালক ও নেপথ্য নাট্যকর্মীর আবির্ভাব হয়েছিল, যাদের অভিনয়ের দক্ষতার গুণে জেলার নাট্যচর্চা অভাবনীয় সমৃদ্ধি লাভ করেছিল। তাই উত্তর দিনাজপুর জেলার ক্রমবর্ধমান নাট্যচর্চার ধারা বেয়ে প্রাক্-স্বাধীনতাপর্বের অসাধারণ কৃতি সম্পন্ন অভিনেতাদের নাট্যাভিনয় সম্বন্ধে ক্ষেত্রসমীক্ষা করে যে তথ্য পেয়েছি তার নিরিখে যথাসাধ্য বিবরণ তুলে ধরছি।

যতীন্দ্রমোহন গোস্বামী:

তিনি ছিলেন সুপুরুষ ও অসাধারণ অভিনেতা। কলকাতায় গোস্বামী পরিবারের সেই বাড়িতে থেকেই যতীন্দ্রমোহন গান, বাজনা, অভিনয় ইত্যাদি বিষয়ে পারদর্শী হয়ে ওঠেন। কলকাতার ঠাকুর বাড়ির উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে যতীন্দ্রমোহনের বন্ধুত্বের সম্বন্ধ হয় এবং সৌমেন্দ্র নাথের সঙ্গে বন্ধু যতীন্দ্রমোহন মাঝে মাঝেই যাতায়াত করতেন জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়িতে।

এইভাবে ঠাকুর বাড়িতে যেতে যেতে রবীন্দ্রনাথের অভিনয় দেখারও সুযোগ হয়েছে যতীন্দ্রমোহনের। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিভিন্ন আলোচনা ও বৈঠকে উপস্থিত থাকারও সৌভাগ্য হয়। এছাড়াও অহীন্দ্র চৌধুরী, শিশির কুমার ভাদুরী, ছবি বিশ্বাস, দূর্গা দাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ প্রখ্যাত অভিনেতাদের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য লাভ করে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠেন।

১৯১৬ সালে রায়গঞ্জে প্রথম নাটক অভিনয় শুরু করেন, যতীন্দ্রমোহন প্রত্যেক অভিনেতা ও অভিনেত্রীকে নির্দেশনা দিয়ে তৈরি করে দিতেন। তিনি প্রত্যেককে অত্যন্ত কঠোর পরিশ্রম করে ঘষে মেজে প্রস্তুত করে দিতেন অভিনয়ের জন্য। কয়েকজন বাদে তাঁদের কারোর অভিনয় বিষয়ে তেমন কোনো পূর্ব অভিজ্ঞতা ছিল না। যতীন্দ্রমোহনের জ্যেষ্ঠ পুত্র কল্যাণ কুমার গোস্বামীকে (মানু) ছাত্রবস্থাতেই অভিনয়ে নামিয়েছিলেন প্রতাপাদিত্য নাটকে কুলগুরু হিসেবে। প্রতাপাদিত্যের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন স্বয়ং যতীন্দ্রমোহন। তিনি নিজের মতো করে পুত্রকে তৈরি করেছিলেন অভিনেতা হিসেবে। গুরু রূপী পুত্রের পায়ে হাত দিয়ে প্রতাপাদিত্যের বেশে প্রণামও করেছিলেন তিনি। রায়গঞ্জের এই গোস্বামী পরিবারের আসরেই সিনেমা জগতের প্রখ্যাত নায়ক ও গায়ক রবীন মজুমদারের হাতে খড়ি হয়েছিল। রাগঞ্জ ইনস্টিটিউটের ''মহারানী স্নেহলতা'' হলে ১৯৩৯ সাল থেকে নিয়মিত নাট্যচর্চা শুরু হল যতীন্দ্রমোহনের পরিচালনায় ও ব্যবস্থাপনায়।

রায়গঞ্জ ইনস্টিটিউটের নাট্যমঞ্চে যতীন্দ্রমোহনের তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় অভিনীত হয়েছে বহু বিখ্যাত নাটক। সুকুমার চন্দ্র গুহ, নির্মল চন্দ্র ঘোষ, ড. জগদীশচন্দ্র সেন, প্রফুল্ল ভট্টাচার্য, কল্যাণ কুমার গোস্বামী, কাচী ভৌমিক, আশুতোষ বাগচী প্রমুখ বিশিষ্ট অভিনেতরা তাঁর সঙ্গে অভিনয় করেছে। তিনি অনেক ভূমিকায় স্মরণীয় অভিনয় করেছেন। বিশেষ করে আলমগীর, প্রতাপাদিত্য গোবিন্দমাণিক্য ইত্যাদি। এছাড়াও কমিক ভূমিকাতেও দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন।

কল্যাণকুমার (মানু) গোঁসাই:

রায়গঞ্জে অবস্থিত গিরিগোঁসাই পরিবারে জ্যেষ্ঠ সন্তান ছিলেন সুঅভিনেতা ও সুদক্ষ পরিচালক কল্যাণকুমার গোঁসাই। কল্যাণবাবুর পিতা যতীন্দ্রনাথ গোঁসাই মহাশয়ের তত্ত্বাবধানেই নাট্যজগতে প্রবেশ। নিজের পিতার সাথে বেশ কয়েকটি নাটকে অভিনয় করেন। তাদের মধ্যে অন্যতম 'রাণাপ্রতাপ'।

নাট্যজগতের বিশেষ করে রায়গঞ্জের সবচাইতে জনপ্রিয় অভিনেতা ছিলেন কল্যানকুমার গোঁসাই। ব্যক্তিত্ববান, অভিজাত, গম্ভীর এবং কেন্দ্রীয় চরিত্রে তিনি ছিলেন অত্যন্ত মানানসই অভিনেতা। ধারালো উচ্চারণ, গভীর কণ্ঠস্বর, প্রয়োজনমত মাত্রার প্রয়োগ ও তীক্ষ্ণতা ভরাট করে রাখতো সমগ্র মঞ্চকে। মূলত ঐতিহাসিক নাটকের বীরত্বময় চরিত্রে তাঁর অভিনয় ব্যঞ্জনা হয়ে

উঠেছে সব চাইতে উজ্জ্বল। অবশ্য সামাজিক নাটকগুলিতেও তাঁর নাট্যপ্রতিভা ক্ষুন্ন হয়নি। দর্শকে পরিপূর্ণ রায়গঞ্জের একটি রঙ্গমঞ্চে অভিনয় চলছিল 'প্রত্যাপাদিত্য' নাটকের। প্রতাপাদিত্যের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন রায়গঞ্জের দিকপাল অভিনেতা যতীন্দ্রমোহন গোস্বামী, আর গুরুর ভূমিকায় নেমেছিলেন তাঁরই পুত্র কল্যাণকুমার গোস্বামী, পিতা-পুত্রের অভিনয়ের এই অপূর্ব দৃশ্য দীর্ঘদিন উজ্জ্বল হয়েছিল নাট্যমোদী রায়গঞ্জবাসীর হৃদয়ের মণিকোঠায়। কল্যাণকুমার গোস্বামী মানুবাবু নামেও পরিচিত ছিলেন।

তাঁর পিতৃদেব যতীন্দ্রমোহন ছিলেন এতদঞ্চলের ১৯২০-১৯৩০ দশকের নাট্য জগতের এক অসাধারণ ব্যক্তিত্ব। অভিনয় কুশলতায় যাঁর খ্যাতি ছিল গগনচুম্বী। শিশুকালেই কল্যাণ কুমার প্রত্যক্ষ করলেন তাঁদের বাড়িতেই নাটক, সঙ্গীত সহ সংস্কৃতি চর্চার আসর বসে প্রতি সন্ধ্যায়। পিতা কলকাতা সহ বাংলার বিভিন্ন স্থানে নাট্যাভিনয় প্রদর্শন করে তিনি আরোহন করেছিলেন গৌরবের উচ্চ শিখরে। পিতার মতোই সুন্দর ও সুঠাম দেহের অধিকারী কল্যাণ কুমারের অভিনয়ে হাতে খড়ি হয়েছিল ছাত্রাবস্থাতেই পিতার কুশলী পরিচালনায়। প্রত্যাপাদিত্য চরিত্রে অভিনয়রত পিতা যতীন্দ্রমোহনের সঙ্গে গুরুর ভূমিকায় পুত্র কল্যাণ কুমারের সফল অভিনয় 'Morning shows the day' এই ইংরেজি আপ্তবাক্য দারুনভাবে সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছিল কল্যাণ কুমারের ভবিষ্যৎ অভিনয় জীবনে। পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে তিনি সাড়া ফেলে দেন সাড়া একের পর এক নাটক অভিনয় করে। শুধু অভিনয়ে নয়, পিতার মেধার পূর্ণ উত্তরাধিকারী রূপে অসংখ্য নাটক পরিচালনায় তাঁর সাফল্য ছিল ঈর্ষনীয়। বরেণ্য অভিনেতা-পরিচালক যতীন্দ্রমোহনের অকাল মৃত্যুতে এতদঞ্চলে নাট্যজগতে সৃষ্টি হয়েছিল যে শূন্যতা কল্যাণ কুমার তা পূরণ করেছিলেন অসামান্য দক্ষতায়।

নাট্য সাধনার পথে প্রতিকূলতা কোনো বাধাই সৃষ্টি করতে পারেনি কল্যাণ কুমারের রায়গঞ্জ ইনস্টিটিউটে নিয়মিত অভিনয় হতে থাকে নানা ধরনের নাটক! প্রতিটি নাটক পরিচালনা এবং মুখ্য চরিত্রে অভিনয়ের ক্ষেত্রে তাঁর সাফল্য ছিল চোখে পড়ার মতো। সতীশ চন্দ্রগুপ্ত এবং কল্যাণ কুমার উভয়ে পারস্পরিক সহযোগিতাতেই করতেন নির্দেশনার কাজ। তাঁদের মধ্যে কখনো ঘটেনি মতপার্থক্য। সম্পাদকের দায়িত্ব বহু বছর সুনামের সঙ্গে পালন করেছেন কল্যাণ কুমার গোস্বামী। একাধিকবার সাধারণ সম্পাদক হিসেবে এই প্রতিষ্ঠান সুষ্ঠভাবে পরিচালনা করে তিনি সম্পাদন করেছেন বহু উন্নয়নমূলক কাজ। তাঁর প্রয়াণের পর বহু বছর অতিক্রান্ত হলেও এই প্রতিষ্ঠানের সদস্য-সদস্যাবৃন্দ গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে আজও স্মরণ করেন তাঁর দক্ষতার কথা। এই প্রতিষ্ঠানের পাঠ্যবিভাগ বহু বছর যাবৎ 'কল্যাণ স্মৃতি নাট্যপ্রতিযোগিতা'র আয়োজন করে তুলে ধরেছিল তাঁর গৌরবময় অবদানের কথা।

কল্যাণকুমার গোস্বামী কখনই নাটককে ছেড়ে থাকেননি। অভিনয়কেই তিনি জীবনের ধ্যানজ্ঞান রূপে গ্রহণ করেছিলেন। তিনি বিভিন্ন ডায়ালগ আউরে তাঁর মনের ভাবকে প্রকাশ করতেন। ঠিক সেইভাবেই তিনি সকলকে মাতিয়ে রাখতেন আনন্দে। তাঁর ছোটবেলাকার অসংখ্য নাটকে অভিনয় আজও রায়গঞ্জবাসীর স্মরণে লেখা রয়েছে। পিতা ঔরঙ্গজেবের ভূমিকায় আর, তিনি নিজে অভিনয় করেছিলেন যশোবন্ত সিংহের ভূমিকায়। এছাড়াও সিরাজউদ্দৌলা নাটকে ওয়াটস্, টিপু সুলতান নাটকে মসিয়ে লালি, গুপেগুণ্ডা ও স্বামী স্ত্রী নাটকে মুখ্য চরিত্রে অভিনয়, কালিন্দী নাটকে মি: মুখার্জী প্রভৃতি চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন। প্রখ্যাত নট ও নাট্যকার শিব প্রসাদ করের সঙ্গেও অভিনয় করেছেন দিনাজপুর নাট্য সমিতির মঞ্চে। বালুরঘাটের প্রখ্যাত নট নাট্যকার ও বিখ্যাত নাট্য পরিচালক হরিমাধব মুখোপাধ্যায় কল্যাণ কুমার গোঁসাই সম্পর্কে একটি প্রাসঙ্গিক মন্তব্য করেছেন— ''মানুদা অর্থাৎ মানু গোস্বামী খুবই বড় মাপের অভিনেতা ছিলেন। তাঁর Stage personality ছিল অসাধারণ। কালিন্দী নাটকে Mr. Sen -এর চরিত্রে তাঁর অভিনয় ছিল অসামান্য পরিবর্তীকালে অভিনয় নাটকে একটি চরিত্রে অনবদ্য অভিনয় করে আমাকে বিস্মিত করেছিলেন। মানুবাবু আমার মতে উত্তরবঙ্গে তদানীন্তনকালে অন্যতম শ্রেষ্ঠ অভিনেতা ছিলেন। রায়গঞ্জ ইনস্টিটিউটের দক্ষ অভিনেতা জ্যোৎস্নাকুমার সেন কল্যাণ কুমার গোস্বামী সম্বন্ধে এক মূল্যবাণ মন্তব্য করেছেন, যা এখানে প্রণিধানযোগ্য— ''সে তার পিতা যতীন গোস্বামী মহাশয়ের সুযোগ্য উত্তরাধিকারী ছিল। তার গম্ভীর কণ্ঠস্বর, পৌরষব্যঞ্জক আকৃতি এবং অপূর্ব অভিনয় প্রতিভা ছিল তাঁর সম্পদ।'' ১৯৪৬-১৯৭০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সতীশচন্দ্র গুপ্ত ও মানু গোঁসাই যুগ বলে রায়গঞ্জের নাট্যচর্চায় অভিহিত হয় এবং এদের অনুসরণে প্রচুর অভিনেতা ও অভিনেত্রীর সংখ্যা বাড়ে ও গুণগতমানে সে সব অভিনেতারা খ্যাতি লাভ করে।

সতীশচন্দ্র গুপ্ত:

রায়গঞ্জ ইনস্টিটিউটে প্রচণ্ড ক্ষমতাবান ও বিদগ্ধ পরিচালক হিসেবে সতীশচন্দ্র গুপ্ত রায়গঞ্জ তথা সমগ্র উত্তরবঙ্গের পরিচিত ছিলেন। যৌবনের প্রথমার্ধে দিনাজপুর নাট্যসমিতির সুঅভিনেতা ছিলেন। তিনি রায়গঞ্জ ইনস্টিটিউটে পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেছেন অন্তত শতাধিক নাটকে। তাঁর পরিচালনার পদ্ধতিতে যথেষ্ট অভিনবত্ব লক্ষ করা যায়। তিনি নাট্য প্রযোজনা করে অপরিসীম দক্ষতার পরিচয় দেন এবং খ্যাতি অর্জন করেন। একজন বিশিষ্ট পরিচালক হিসেবে সতীশচন্দ্র গুপ্ত ছিলেন যথেষ্ট আধুনিক। নিজে একজন অভিনেতা হলেও তিনি অভিনেতাদের প্রশিক্ষণ প্রদানে সিদ্ধহস্ত ছিলেন ও নাটকের বিষয়ে বহু গুণে গুণান্বিত। তিনি অভিনেতাদের 'মুভমেন্ট' কণ্ঠের ওঠানামা, মঞ্চে অভিনয়ের প্রতিটি মুহূর্তকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করতেন যথেষ্ট দক্ষতার সাথে।

তিনি একজন অভিনেতাকে স্ববিকশিত হবার পূর্ণ সুযোগ করে দিতেন ও ভুল হলে সংশোধনও করে দিতেন। তিনি বিভিন্ন টাইপ চরিত্রে এবং কমিক চরিত্রে শক্তিশালী অভিনেতা ও পরিচালকের দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন।

অনেকেই মনে করতেন যে স্বাধীনতা পরবর্তীযুগে রায়গঞ্জ ইনস্টিটিউট একজন প্রকৃত নাট্য শিক্ষককে পায় তাঁর নাম সতীশচন্দ্র গুপ্ত। তাঁর হাত ধরেই দীর্ঘদিন ধরে রায়গঞ্জ ইনস্টিটিউট একটি উঁচু মান বজায় রেখেছিল। একজন পরিচালকের যেমন শুধু অভিনয় জানলেই চলবে না, অনেক গুণ থাকা দরকার। সতীশচন্দ্র গুপ্তও তেমনি নানা গুণের অধিকারী ছিলেন। রায়গঞ্জ ইনস্টিটিউটে ধারাবাহিকভাবে নায়কের ভূমিকায় অভিনয়কারী ও সেকালের নাট্যমঞ্চের সাথে যুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে বর্তমানে সবচাইতে প্রধান পরিতোষ সরকার বলেছেন— ''সতীশচন্দ্রের মতো একজন পরিচালক পাওয়া অসম্ভব। ... ব্যক্তিত্ব আকাশচুম্বি বর্ণ-ধর্ম-বয়স তাঁর কাছে কোন বাধাই ছিল না। ... এছাড়াও নাচ-গান-আবৃতি-অভিনয় মজার কথায় তাঁর জুরি ছিল না।'' রায়গঞ্জ ইনস্টিটিউটকে ঘিরে বহু গুণী লোকের সমাগম ঘটেছিল। নাট্যকার মন্মথ রায় সতীশচন্দ্রকে লিখেছিলেন, 'শিবপ্রসাদ কর, সুরেশ দাস, ভেটিবাবু প্রমুখ নাট্যশিল্পীদের পাশে তোমার নাট্যকুশলতার স্মৃতিও আজ আমার মানসপটে অম্লান রহিয়াছে।''

সতীশচন্দ্র 'ন্যাচরাল' বা 'আণ্ডার অ্যাকটিং' এ বিশ্বাসী ছিলেন। 'ওভার অ্যাকটিং' এ নয়। তাঁর অভিনয় ছিল জীবন্ত। সব ধরনের চরিত্রে তিনি দিয়েছেন অসাধারণ দক্ষতার পরিচয়। পকেটমার থেকে জমিদার সব ধরনের চরিত্রে ছিলেন জীবন্ত অভিনেতা। অনেক ক্ষেত্রে নিজের চরিত্রের মেকআপ তিনি নিজেই করতেন। তিনি অসাধারণ সুকণ্ঠের অধিকারী ছিলেন ও কবিতাও আবৃতি করতেন। কয়েকটি ছোটগল্পের নাট্যরূপও দিয়েছেন। সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল— সাহাজানের মৃত্যু, চিকিৎসা সংকট, ডালিয়া প্রভৃতি। পশ্চিম দিনাজপুর জেলার নাট্যহালা শতবর্ষপূর্তি উৎসবে ১৯৭৩ সালে সতীশচন্দ্রকে, তাঁর অনুপস্থিতিতে, মানপত্র ও উত্তরীয় দিয়ে সম্মান জানিয়েছিল। ১৯৪৬-১৯৭০ খ্রি: পর্যন্ত সতীশচন্দ্র গুপ্ত ও মানু গোঁসাই যুগ নামে অভিহিত হয়। শতীশচন্দ্র পুপ্তের হাতেই রায়গঞ্জের নাট্যচর্চার জগতে অনেক নাট্যশিল্পী উঠে এসেছিলেন এবং তারা গুণগতমানেও বিপুল প্রশংসিত হয়।

কামিক্ষা চ্যাটার্জী:

পশ্চিম দিনাজপুরের অধীনভুক্ত উত্তর দিনাজপুর জেলার অন্যতম ও উল্লেখযোগ্য নাট্যমঞ্চ রায়গঞ্জ ইনস্টিটিউট (রায়গঞ্জ স্নেহলতা হল ও স্নেহলতা পার্ক) স্থাপনের অন্যতম উদ্যোক্তা ও দক্ষ অভিনেতা ছিলেন কামিক্ষা চ্যাটার্জী। তিনি ছিলেন বিন্দোল এস্টেটের জমিদার। তিনি রায়গঞ্জ,

হরিপুর, মালদুয়ার ও দিনাজপুর শহরের বিংশ শতাব্দীর ৩য় ও ৪র্থ দশক থেকে বিভিন্ন নারী চরিত্রে অভিনয় করে খ্যাতি লাভ করেন। তবে তিনি বেশিরভাগ সময় দেশভাগের পর কাটিয়েছেন রায়গঞ্জে। দুর্গাপূজার সময় তিনি স্বকীয় উদ্যোগে বিন্দোলের বাড়িতে নাটক অনুষ্ঠানে আয়োজন করতেন। সেখানে সুঅভিনেতা যতীন গোঁসাই, মানু গোঁসাই, প্রফুল্ল ভট্টাচার্য প্রমুখ অভিনয় করেছেন আমন্ত্রিত নাট্যশিল্পী হিসাবে। এইভাবে তিনি দুই প্রজন্মের মধ্যে মেলবন্ধন ঘটিয়েছেন। রায়গঞ্জ ইনস্টিটিউট মঞ্চে দুই-একটি অভিনয় করেছিলেন ১৯৫০ এর দশকে। তিনি কলকাতার শিশির ভাদুড়ী সম্প্রদায়ের সঙ্গে স্ত্রী ভূমিকায় অভিনয় করে যথেষ্ট খ্যাতি ও সুনাম অর্জন করেছিলেন।

ডা: জগদীশ সেন:

উত্তরদিনাজপুর জেলার রায়গঞ্জ ইনস্টিটিউটের প্রথম পর্বের একজন ক্ষমতাবান অভিনেতা ছিলেন ডা: জগদীশচন্দ্র সেন। তাঁর বলিষ্ঠ দেহ, স্পষ্ট বাচনভঙ্গী, উদাত্ত কণ্ঠ তাঁকে একজন যথেষ্ট মর্যাদাপূর্ণ ও অসাধারণ নট করে তুলেছিল। তিনি নানা রকমের ও স্বাদের অভিনয়ে অবতীর্ণ হতেন। তাঁর বিশেষ দক্ষতাগুলির মধ্যে ছিল দ্রুত ভাবপরিবর্তন করার কৌশল। 'সরলা' নাটকে তাঁর গদাধর চন্দ্র চরিত্রটি অসাধারণ ছিল, যা এখনোও নাট্যদর্শকমহল ভুলতে পারেনি। এছাড়াও তিনি 'দিলদার' ও 'ভবানন্দ মজুমদার'-এর ভূমিকায় যথেষ্ট প্রসংশনীয় অভিনয় করেছেন। ডা: জগদীশ চন্দ্র সেন 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকে 'সেলুকাস'-এর ভূমিকায় অভিনয় করেছেন। তিনি চল্লিশের দশকে অনেক নাটকেই অভিনয় করে সারা জেলা জুরে সাড়া ফেলে দেন এবং সুউচ্চ প্রসংশা লাভ করেন।

উপেন বসু:

উপেন বসু শুধু অভিনয় করতেন না, সেই সঙ্গে তিনি একজন নাট্যশিল্পীও ছিলেন। বেশিরভাগ দৃশ্যপট তিনি নিজেই অঙ্কন করে সেই সময়কালে বেশ আলোড়ন ফেলে দিয়েছিলেন। এর পাশাপাশি তিনি নৃত্যগীতেও যথেষ্ট দক্ষ ছিলেন।

আশুতোষ বাগচী:

রায়গঞ্জ ইনস্টিটিউটের শুরুর পর্বের বিশিষ্ট অভিনেতা ছিলেন। তিনি বেশ কয়েকটি নাট্যগুণের অধিকারী ছিলেন। যেমন— উদার কণ্ঠ, আবৃতিকার ও সুপুরুষ। রায়গঞ্জ ইনস্টিটিউটের অনেকগুলি নাটকে অভিনয় করে তিনি সুনাম অর্জন করেছিলেন।

সুকুমার গুহ:

বিশ দশকের অভিনেতাদের মধ্যে সুকুমার গুহ ছিলেন প্রবীনতম অভিনেতা। তাঁর বলিষ্ঠ ভূমিকার রূপায়নে বিশেষভাবে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। স্মরণীয় ভূমিকার মধ্যে উল্লেখযোগ্য

'রঘুপতি' চরিত্রে অভিনয়। এ অভিনয় আজও দর্শকের কাছে স্মরণীয় হয়ে আছে।

ড: বৃন্দাবন বাগচী:

রায়গঞ্জ ইনস্টিটিউট-এর বিশিষ্ট অভিনেতা এবং স্বণামধন্য, খ্যাতনামা নাট্যকার। সত্তর দশকের রায়গঞ্জের নাট্যব্যক্তিদের মধ্যে তিনি অন্যতম ছিলেন। তিনি প্রধান চরিত্রে অভিনয় না করলেও মূলত পার্শ্ব-চরিত্রে অভিনয় করেছেন। তিনি বেশ কিছু নাটকে সুনামের সঙ্গে অভিনয় করেছেন। রায়গঞ্জের ক্রমবর্ধমান নাট্যচর্চার জগতে অবস্থান করে তিনি নাট্যরচনাতেও ব্রতী হয়েছিলেন। তিনি বেশ কিছু পূর্ণাঙ্গ ও একাঙ্ক নাটক রচনা করে সারা জেলা সহ বৃত্তর বাংলায় তথা দেশীয় স্তরে সুখ্যাতি অর্জন করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য নাটকগুলি হল— 'এক ডোরে বাধা', 'আকাশভরা তারা', 'এরা মানুষ খায়', 'বাসব ও দানব', 'কাটা মুণ্ডুরা কথা কয় ও একাঙ্ক গুচ্ছ', 'মার্শাল পিক' ও 'রক্তবীজ'। সর্বোপরি এ কথা বলা যায় যে রায়গঞ্জের নাট্যচর্চার সুমহান ঐতিহ্যকে তিনি তার সৃজন পর্বের মধ্য দিয়ে গৌরবান্বিত করে তুলেছিলেন।

কিষাণলাল ঘোষ:

১৯৪০-১৯৫০ খ্রিস্টাব্দের রায়গঞ্জ ইনস্টিটিউটের বেশ কিছু নাটকের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অভিনয় করেছেন কিষাণলাল ঘোষ। তিনি বহুকাল ধরে রায়গঞ্জ ইনস্টিটিউটের নানা পদ অলঙ্কৃত করেছেন যথেষ্ট দক্ষতার সঙ্গে। পরম মানবহিতৈষী এই ব্যক্তিটি রায়গঞ্জে বেশ জনপ্রিয় ছিলেন।

রায়গঞ্জ ইনস্টিটিউটের স্বাধীনোত্তর পর্বের প্রখ্যাত ও বিশিষ্ট অভিনেতা ও অভিনেত্রীবৃন্দ:

কালী নন্দী:

তিনি বহুকাল ধরে প্রায় দুই দশক ধরে রায়গঞ্জ ইনস্টিটিউট এ অভিনয় করেছেন। তিনি শুধু নায়কের ভূমিকাতেই অভিনয় করতেন না। তিনি বিভিন্ন পার্শ্বচরিত্রেও বেশ যশের সঙ্গে অভিনয় করতেন। শুরুতে মাঝে মাঝে অভিনয় করলেও পরবর্তীকালে প্রায় নিয়মিতভাবে অভিনয় করতেন।

যুধিষ্ঠির দাস:

তিনি বেশ দক্ষতার সাথে নাটকে পেশাদারিত্ব করেছিলেন। নিম্নবর্গের থেকে আগত যুধিষ্ঠির দাস নিজেদের দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন। তিনি অত্যন্ত লোকপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। রায়গঞ্জের মঞ্চকে যারা মাতিয়ে গেছেন, তার অন্যতম অভিনেতা যুধিষ্ঠির দাস। এরই পাশাপাশি তিনি একজন অত্যন্ত ভাল তবলাবাদক ছিলেন। রায়গঞ্জের মঞ্চকে 'টাইপ' রোলে যারা মাতিয়ে গেছেন তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন যুধিষ্ঠির দাস।

জ্যোৎস্না কুমার (কার্তিক) সেনগুপ্ত:

তিনি রায়গঞ্জের একজন বিখ্যাত অভিনেতা ছিলেন। ছোটবড় নানা চরিত্রে ছাড়াও নায়কের

ভূমিকায় কিছু অভিনয় এবং পরিচালনা করেছেন কয়েকটি নাটক। এখানে প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে জমিদার কামাক্ষা চ্যাটার্জী কলকাতায় ছাত্রাবস্থায় যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছিলেন ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে 'সাজাহান' নাটকে। সঙ্গে জাহানারার ভূমিকায় অভিনয় করে শিশির কুমার ভাদুড়ীর সঙ্গে জ্যোৎস্না সেন দক্ষ রবীন্দ্র সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন। স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার অভ্যস্ত থেকে জীবনের শেষ পর্বে বৃহত্তর সাংস্কৃতিক আঙ্গিনায় প্রবেশ ঘটেছিল তাঁর— ''গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংযমের রায়গঞ্জের সভাপতি হয়েছিলেন তিনি। বিশেষ করে ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে উদাহরণ নাটকে কার্ত্তিকের ভূমিকায় প্রথম ইনস্টিটিউট সঙ্গে পদার্পণ করেন। তিনি স্ত্রী ভূমিকা দিয়ে অভিনয় শুরু করেন। ঐতিহাসিক ও সামাজিক প্রায় সব রকম নাটকে বিভিন্ন রকমের চরিত্রে অভিনয় করে দর্শকদের কাছে প্রশংসিত হয়েছিলেন। তিনি পৌরাণিক, ঐতিহাসিক, সামাজিক সব রকম নাটকে স্ত্রী ভূমিকা থেকে শুরু করে বিভিন্ন ধরনের চরিত্রে অসাধারণ অভিনয় করে দর্শকদের প্রশংসা লাভ করেন।

পরিতোষ সরকার:

পরিতোষ সরকার ১৯৩৫ সালের পর নাট্য জগতে প্রবেশ করেন। ১৯৪৯ সালে রায়গঞ্জের দীপাবলি উৎসবের ''পতিব্রতা' নাটকে হাতেখড়ি। যুবা রোমান্টিক নাটকের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন বেশ কয়েক বছর ধরে ১৯৫০ এর দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে ১৯৫০ এর দশকের মধ্যবর্তী সময় পর্যন্ত। পরিতোষ সরকারের বেশ জনপ্রিয়তা ছিল রায়গঞ্জে। তিনি রায়গঞ্জ করোনেশন হাই ইংলিশ স্কুলে পড়াশুনা করেছেন এবং সেই সময় স্কুলের বেশ কতকগুলি নাটকে অভিনয়ও করেছেন। রায়গঞ্জ ইননিস্টটিউটের নাট্য সম্পাদকও ছিলেন। তিনি চল্লিশের দশক থেকে নাটকের অভিনয়ের জগতে পদার্পণ করেছেন এবং প্রত্যেক চরিত্রের ভূমিকায় চরিত্রকে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলতে সম্মত হয়েছেন, তাঁর শারীরিক সৌন্দর্যের গুণে।

ড: যতীন দে:

ড: যতীন দে ছিলেন একজন কবাটবক্ষ, দীর্ঘদেহী ও গুরুগম্ভীর কণ্ঠের অধিকারী। রায়গঞ্জে ১৯৫২ সালের পর থেকে অভিনয় শুরু করেছিলেন বিভিন্ন পাশ্বচরিত্রে। নাটকের হাতে খড়ি হয়েছিল পার্বতীপুর 'রেলওয়ে ইনস্টিটিউট' হলে। তিনি সতীশচন্দ্র গুপ্তের একজন সহযোগী ও বন্ধু ছিলেন। তরুণ ও নবীনদের মঞ্চে প্রতিষ্ঠার পক্ষপাতী ছিলেন।

প্রশান্ত ভৌমিক:

তিনি অত্যন্ত কম বয়স থেকেই নাটকের জগতে প্রবেশ রকরেন। অত্যন্ত অল্প বয়সে রায়গঞ্জ ইনস্টিটিউটে নাটক শুরু করেন। পলিটেকনিক ও বহরমপুরে চাকরীকালে এবং তারপর ইনস্টিটিউট থেকে তিনি নাটক শুরু করেন স্থায়ীভাবে। পরবর্তীকালে 'ছন্দম' নাট্যগোষ্ঠীতে পরিচয় রেখেছিলেন

সুদক্ষ অভিনেতা হিসাবে।

অসিত (পাঁচকড়ি) সেনগুপ্ত:

রায়গঞ্জের নাট্যমঞ্চে একসময় একা বহু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। তিনি যতখানি অভিনেতা হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন তার চাইতে অনেক খানি বেশি ভূমিকা পালন করেছেন নাটকে গানের সুরকার, নেপথ্য থেকে কণ্ঠ সঙ্গীত পরিবেশন এবং প্রম্পটারের কাজে নৈপুণ্য প্রদর্শন করে। 'অপরা' নামে এক নাট্য গোষ্ঠীতে যতীন গোঁসাইয়ের সঙ্গে নাট্যজগতে কাজ করেছিলেন তিনি। এছাড়াও 'বাইন কোর্ট অব ওয়ার্ডস' দপ্তরে কর্মরত থাকার সময় একগুচ্ছ অভিনেতাকে সাথে পাওয়ার সুযোগ হয়েছিল তাঁর।

শক্তি চন্দ্র:

তিনি প্রথম দিকে রায়গঞ্জ ইনস্টিটিউটে অভিনয় করতেন। তিনি সহকর্মী গোপাল দত্তের অনুপ্রেরণায় রায়গঞ্জ ইনস্টিটিউটে যোগদান করেছিলেন। বিখ্যাত নাট্যকার সতীশগুপ্তের নজরে পড়ে যান সেখানে। অভিনয় করার পাশাপাশি তিনি সেখানে নাট্যাবিভাগের সম্পাদকের দায়িত্ব নিয়েছিলেন। তাঁর সম্পাদনায় অসংখ্য একাঙ্ক নাটক অভিনীত হয় রাইনাতে। এরপর তিনি নানা কারণে রায়গঞ্জ ইনস্টিটিউট থেকে বেড়িয়ে ... যোগ দেন ছন্দমে। অভিনয়টা যেন তাঁর রক্তে ছিল। তাঁর অভিনীত উল্লেখযোগ্য নাটকগুলির মধ্যে 'ফেরারী ফৌজ', 'নীলদর্পণ', 'শাস্তি' প্রভৃতি। তিনি 'নীলদর্পণ'-এ সাধু, 'ফেরারী ফৌজ'-এ বাবা ও 'শান্তি' নাটকে বড় ভাইয়ের চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন যা দর্শকের মন জয় করেছিল।

মহিলা চরিত্রে পুরুষ অভিনেতা:

১. কৈলাশ দাস:

নারী চরিত্রে অভিনয়কারী কৈলাশ দাস ছিলেন ১৯৩০ দশক থেকে ১৯৫০-এর দশকের মধ্যমর্তী সময় পর্যন্ত রায়গঞ্জ মঞ্চের অভিনেতা ও একমাত্র পেশাদার সঙ্গীত সেতার শিক্ষক। পুরুষদের দিয়ে নারী ভূমিকায় অভিনয় করানোর সর্বকালে স্থানীয় সর্বশ্রেষ্ঠ নারী চরিত্রের অভিনেতা ছিলেন।

২. বিমল দাসগুপ্ত:

১৯৩০-এর দশকে 'দিনাজপুর নাট্য সমিতি'তে নাটকের জীবন শুরু। শিবপ্রসাদ কর, সতীশচন্দ্র গুপ্ত, সুশীল সেন প্রমুখ সঙ্গে অভিনয় করেছেন। বেশ কয়েকবার দক্ষতা ও প্রশংসার সাথে রায়গঞ্জ ইনস্টিটিউট এসে নারী ভূমিকায় অভিনয় করেছেন। বালুরঘাট ও মালদহ অভিনয় করেছেন দক্ষতার সঙ্গে।

৩. নির্মল (মনু) দাসগুপ্ত:

দেশভাগ পর্যন্ত 'দিনাজপুর নাট্যসমিত'তে এবং ১৯৫০ সালের পর থেকে বালুরঘাট মঞ্চে এবং তারই মাঝে মাঝে এসে রায়গঞ্জ ইনস্টিটিউটে অভিনয় করেছেন নারী চরিত্রে। তিনি ছিলেন অত্যন্ত দক্ষ নারী চরিত্রাভিনেতা। স্বাধীনতার পূর্বে ঠাকুরগাঁ ও হরিপুরের নাটকে অভিনয় করেছেন বেশ দক্ষতার সাথে খ্যাতির পরিচয় দিয়ে সাফল্য ও প্রশংসার অধিকারী হয়েছিলেন।

মহিলা চরিত্র:

তৃপ্তি রায়:

স্বাধীনতার পর কালিয়াগঞ্জ এসে পিতা-মাতা, ভাই-বোনদের সাসে বসবাস শুরু করেন। সেখান থেকে নিয়মিত রায়গঞ্জ এসে নাটকের মহলা দিতেন। কালিন্দী নাটক দিয়ে ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দে অভিনেত্রী জীবনের শুরু। তিনি অত্যন্ত সুঅভিনেত্রী ছিলেন। মোটকথা পঞ্চাশের দর্শক থেকে প্রথম যে মহিলা শিল্পীরা যোগ দিয়েছিলেন, তাদের মধ্যে অভিনয়ে তিনি উল্লেখযোগ্য পারদর্শিতার পরিচয় দিয়েছিলেন। তৃপ্তি রায় বেশ কিছু নাটকে অপূর্ব অভিনয় করেছেন। যেমন— মা ফিন (উল্কা), সারি (কালিন্দী), আলেয়া (সিরাজদ্দৌলা) ইত্যাদি।

ছন্দম:

রায়গঞ্জের নাট্যতথা সাংস্কৃতিক জগতে 'ছন্দম' নাট্যসংস্থা আবির্ভূত হয়ে অবিভক্ত দিনাজপুর জেলার তথা রায়গঞ্জের সুমহান নাট্য ঐতিহ্যেকে তুলে ধরেছিল এবং ঐতিহ্যময় নাট্যচর্চার মধ্য দিয়ে এই নাট্যসংস্থা ক্রমান্বয়ে সমগ্র বাংলাজুড়ে পরিচিতি লাভ করে। ছন্দম প্রগতিশীল অপেশাদার নাট্যসংস্থাগুলির মধ্যে এক স্বীকৃত ও উল্লেখযোগ্য নাট্যসংস্থা। এই সংস্থার নিজস্ব আধুনিক নাট্যমঞ্চকে কেন্দ্র করে সুদক্ষ অভিনেতা-অভিনেত্রী, নাট্য-পরিচালক, নাট্য-নির্দেশক ও নাট্যকর্মীর আবির্ভাব হয়। এই অভিনেতা-অভিনেত্রীরা দক্ষতার সাথে দর্শক মনোরঞ্জন করে জেলা সহ উত্তরবঙ্গে এমনকি বৃহত্তরবঙ্গে সুখ্যাতি ও পরিচিতি লাভ করেন।

সুধাংশু দে:

সুধাংশু দে নাট্যচর্চার প্রথমের দিকে ফাঁকা মাঠে, অস্থায়ী আচ্ছাদনে প্রভৃতি স্থানে অভিনয় করতেন এবং পরবর্তীকালে রায়গঞ্জের নাট্যজগতে প্রসংশনীয় ভূমিকা নিয়েছিলেন। রমেন্দ্রপল্লীর দুর্গোৎসবের মাঠে, কলেজে, এরপর রায়গঞ্জ ইনস্টিটিউটের নাটকে অভিনয় করতেন। দ্বাদশ নাট্যসংস্থার প্রতিস্থাতা সদস্যদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন সুধাংশু দে। এরপর 'ছন্দম' নাট্য সংস্থায় যোগ দেন এবং সংস্থার প্রায় প্রতিটি নাটকেই অভিনয় করতেন। প্রতিটি চরিত্রেই তিনি অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। সুধাংশু দের নাটকের জন্য এই অক্লান্ত পরিশ্রম, উদ্দমতা রায়গঞ্জের

নাট্যজগতে একটি নজীরবিহীন দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করেছিলেন।

অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়

উত্তর দিনাজপুর জেলার জেলাসদর রায়গঞ্জের অন্যতম ও উল্লেখযোগ্য নাট্যসংস্থা ছন্দমের প্রথম পর্বের সুঅভিনেতা ও নাট্যব্যক্তিত্ব নির্দেশক ও নাট্যকার হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন। ছন্দম নাট্যসংস্থার সাথে ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দে যুক্ত হয়ে প্রথমে অভিনয় ও পরে নির্দেশনার কাজে অংশগ্রহণ করেন। সহকারী নির্দেশক, মুখ্য নির্দেশক এবং যৌথ নির্দেশনার দায়িত্বে ছিলেন বিভিন্ন প্রযোজনায়। যেমন, অগ্নিগর্ভ লেনা (শ্যামাকান্ত দাস) আজকের হ্যামলেট (অসিত বসু), পদ্য-গদ্য-প্রবন্ধ (জোছন দস্তিদার), ফুলমোতিয়া (সুপ্রিয় সর্বাধিকারি), আবার যদি (চন্দন সেন)। নিজস্ব নাটক ও নির্দেশনা : উত্তরাধিকার ও বদনাম (রবীন্দ্রনাথ)।

উপরোক্ত নাটকগুলি সহ যেসব নাটকে উল্লেখযোগ্য চরিত্রে অভিনয়ে অংশগ্রহণ যেমন, ছেঁড়াতার, শেষ থেকে শুরু, নাট্যকারের সন্ধানে ছয়টি চরিত্র, নীলদর্পণ ও ফেরারীফৌজ। গল্পের নাট্যরূপ দান যেমন, সমুদ্র মন্থন (ইন্দু সাহা) মন্ত্রিপুত্র নটরাজন গল্প অবলম্বনে উত্তরাধিকার, গোধূলি (পরিতোষ গুহ) ও বদনাম (রবীন্দ্রনাথ) এবং চারটি পথ নাটক রচনা করেন এবং উত্তর দিনাজপুর জেলার নাট্যজগতে যথেষ্ট আলোড়ন সৃষ্টি করে সমৃদ্ধ করে তুলেছিলেন।

শুভাশীষ গুপ্ত:

রায়গঞ্জ তথা সমগ্র উত্তরবঙ্গের একজন বিশিষ্ট নাট্যপ্রেমী ও নাট্যঅভিনেতা হলেন শুভাশীষ গুপ্ত। সতীশচন্দ্র গুপ্তের সন্তান হওয়ায় তিনি ছোটোবেলা থেকেই নাটকের সংস্পর্শে আসতে পেরেছিলেন। বিতর্ক, তাৎক্ষণিক বক্তৃতা ও আবৃতি প্রভৃতি ছিল তাঁর বিশেষ গুণ, যা অভিনয়ে যথেষ্ট সাহায্য করেছিল তাঁকে। রমেন্দ্রপল্লী ও রায়গঞ্জ ইনস্টিটিউট এ অভিনয় করে গেছেন সমানভাবে। এরপর জলপাইগুড়িতে নাট্যকার গণেশ চন্দ্ররায়ের কাছে অভিনয় শেখার সুযোগও পেয়েছিলেন। 'ছন্দম'-এর প্রতিষ্ঠাকাল থেকে তিনি ছিলেন এর অন্যতম প্রাণপুরুষ। পরবর্তীকালে কলকাতার মধ্যমগ্রামে 'চারণ সাহিত্য চক্র'-এ নাটক করেছেন তিনি।

অচিন্তকুমার সেন:

অচিন্ত কুমার সেন নাট্যবিভাগের শিল্পীদের মধ্যে অন্যতম। তিনি ছিলেন সুদর্শন, দীর্ঘদেহী এবং শক্তিশালী অভিনেতা। তার একটি উল্লেখযোগ্য গুণ হল— তিনি ছিলেন মধুর কণ্ঠের অধিকারী। তিনি ছিলেন একাধারে শিল্পী ও অভিনেতা। তার মধুর কণ্ঠস্বর দর্শককে মুগ্ধ করে রাখত।

প্রফুল্ল ভট্টাচার্য:

হরিপুর এস্টেটে চাকরি করার সময় থেকে অর্থাৎ ১৯৩০-এর দশক থেকে তিনি অভিনয়ের সঙ্গে যুক্ত হন। হরিপুর এস্টেটে চাকরি করার সময় সেখানে তিনি যতীন গোঁসাই, সতীশচন্দ্র গুপ্ত প্রমুখের সাথে নাটক করেছেন। তিনি বেশ কয়েকটি নাটক পরিচালনাও করেছেন। রায়গঞ্জ-এ তিনি মানু গোঁসাই, পাঁচকড়ি সেন প্রমুখের সাথে অভিনয় করেছেন মহারাণী স্নেহলতা হলে। তিনি টাইপ চরিত্রের দক্ষ অভিনেতা ছিলেন। তিনি 'খোজা পিদ্রুস' (মীরকাশিম), মনোহর (সংগ্রাম ও শান্তি) ইত্যাদি অনেক ভূমিকায় অভিনয় করে প্রশংসা অর্জন করেছিলেন।

অরুণ হোড়:

ছোটোবেলা থেকেই নাটকের প্রতি একটা তীব্র আকর্ষণ ছিল নাট্যকার অরুণ হোরবাবুর। ছাত্রাবস্থা থেকেই বিশিষ্ট নাট্যানুরাগীদের সঙ্গে বন্ধুর সম্পর্ক ছিল। তিনি ছিলেন একজন যথার্থ নাট্যদরদি কর্মী। অভিনয়ের ক্ষেত্রে অরুণ হোড় ছিলেন সম্পূর্ণ ব্যতিক্রমী। নাট্যদলে প্রায় সব অভিনেতা-অভিনেত্রী-ই চান যে এমন চরিত্রে তিনি অভিনয় করবেন, যা দর্শক মনকে ছুঁয়ে যাবে। কিন্তু অরুণ বাবু যে চরিত্রই হোক না বলতেন না। শুধুমাত্র মঞ্চে উপস্থিতি বা ২/১ টা সংলাপ, সবেতেই তিনি রাজি ছিলেন। আজও মনে পড়ে যতীনবাবুর চাকর-এর কথা। এক অশিক্ষিত গ্রাম্য জোতদার ধরণীর ভূমিকায় অরুণবাবুর চরিত্রায়ণ। বিচিত্র ভাবভঙ্গি, অসাধারণ মেক-আপ ও অদ্ভূত সুন্দর চরিত্রায়ণ। তিনি একজন প্রকৃত নাট্যকর্মী বা নাটক প্রেমিক ছিলেন বলেই দিনেরপর দিন প্রায় সব নাটকেই উপস্থিত থেকেছেন, শুধুমাত্র নাটকের শ্রীবৃদ্ধির জন্য।

প্রশান্ত ভৌমিক:

তিনি একজন সুঅভিনেতা ছিলেন। নাটকে তিনি অভিনয় করেছেন বেশ দক্ষতার সাথে। তাঁর অভিনীত উল্লেখযোগ্য নাটকগুলি হল— 'অগ্নিগর্ভ লেনা', 'নীলদর্পন', 'ফেরারী ফৌজ' প্রভৃতি। 'অগ্নিগর্ভ লেনা'য় বধির ফাদার', 'নীলদর্পণে'-এ জমিদার ও 'ফেরারী ফৌজ' নাটকে ফাটার ফ্ল্যাশগান চরিত্রে অসাধারণ অভিনয় করেছেন।

প্রশান্ত সেনগুপ্ত:

এই নরম প্রকৃতির মানুষটি বৈবাহিকসূত্রে ছন্দমের অভিনেত্রী ভারতী সেনের সঙ্গে আবদ্ধ হওয়ায় ছন্দমের সাথে যুক্ত হয়ে পড়েন এবং দেখাগেছে পরবর্তীকালে নিজের সাংগঠনিক ও অভিনয় ক্ষমতা বলে ছন্দমের একজন প্রাণপুরুষ হয়ে ওঠেন। তিনি প্রথমে Promoter -এর ভূমিকার মধ্য দিয়ে ছন্দমে কাজ শুরু করেন। পরবর্তীকালে প্রতিষ্ঠানের কোশাধ্যক্ষ ও সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করে এই নাট্যসংস্থাকে সমৃদ্ধির শিখরে নিয়ে গিয়েছিলেন। প্রশান্ত সেনগুপ্ত ওরফে কাজলবাবু এই প্রতিষ্ঠানের নেপথ্যে কাজ নিয়েই বেশি ব্যস্ত থাকতেন। তবে মাঝে মাঝে তাঁকে মঞ্চেও থাকতে

দেখা গেছে। তিনি অভিনয় করেও বেশ সফল হয়েছেন। আজকের হ্যামলেট নাটকে কবি সুবোধবাবুর চরিত্রে ও অগ্নিগর্ভ লেনা-র টাভুস্কি চরিত্রে অভিনয় করে সকল উপস্থিত নাট্যপ্রেমী দর্শককে মুগ্ধ করে দিয়েছিলেন। নাট্যজগতে যদি ছন্দমের কোন ভূমিকা থাকে তবে তা প্রসান্ত সেনগুপ্তকে বাদ দিয়ে ভাবা সম্ভব নয়। তাঁর অসাধারণ অবদানের জন্য তাঁর প্রিয় ছাত্রছাত্রীদের দ্বারা গড়ে উঠেছে— 'প্রশান্ত সেনগুপ্ত মেমোরিয়াল চিল্ডরেন ড্রামা স্কুল'।

সুব্রত রায়:

উত্তর দিনাজপুর জেলার ছন্দম নাট্যসংস্থার একজন বিশিষ্ট অভিনেতা ও নাট্যকার হলেন সুব্রত রায়, তিনি বহু নাটকে অভিনয় করেছেন যথেষ্ট দক্ষতার সাথে। তিনি সব নাটকে অভিনয় করে যথেষ্ট সম্মান অর্জন করেছেন সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল— আজকের হ্যামলেট, গদ্য পদ্যপ্রবন্ধ, ফেরারী ফৌজ, যতীন বাবুর চাকুর, আমি মেয়ে জবাব প্রভৃতি। তিনি আজকের হ্যামলেট নাটকে প্যাডলভ, গদ্যপদ্য প্রবন্ধ নাটকে হুলো, যতীনবাবুর চাকর নাটকে ক্ষেতমজুর ও দহন নাটকে স্কুল সম্পাদকের চরিত্রে অভিনয় করেছেন।

মৃণালকান্তি বিশ্বাস:

মৃণালকান্তি বিশ্বাস অভিনেতাই ছিলেন না, তিনি ছিলেন নিপুণ সংগঠক। তিনি ছন্দমের জন্মলগ্ন থেকেই নানাভাবে এর সাথে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। নিয়মনিষ্ঠ, মিষ্টিভাষী, অজাতশত্রু মৃণালকান্তি বাবু, অভিনেতা হিসেবে তিনি ছিলেন ঈর্ষণীয়। তাঁর সাংগঠনিক দক্ষতা ও কুশলী পরিচালনা ছন্দম-এর চলার পথকে মসৃণ ও গতিশীল করেছে। তাঁর অভিনীত নাটকগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল— 'ছেড়াতাঁর', 'ফেরারী ফৌজ', 'আজকের হ্যামলেট' প্রভৃতি। 'ছেঁড়াতার'-এ 'শ্রীমন্ত', 'ফেরারী ফৌজ'-এ 'মাস্টারমশাই'-এর চরিত্রে অভিনয় দর্শকের মন জয় করে সু-উচ্চ খ্যাতি লাভ করেছেন। মৃণালকান্তি বিশ্বাস অভিনীত 'মাতা প্রসাদ' অভিনয়, এতটা বাস্তব ও নিখুঁত হয়েছিল যে বিহারের প্রত্যন্ত গ্রামে একজন দারিদ্র অশিক্ষিত ও অসহায় পিতা যেন আমাদের দেখে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। যেন সত্যি বিহারের প্রত্যন্ত গ্রামের দরিদ্র, অশিক্ষিত, অসহায় পিতা। তিনি বিভিন্ন সংস্থা থেকে সমানভাবে পুরস্কৃতও হয়েছেন। পশ্চিবঙ্গ সরকার পুরস্কৃত 'ফুল মতিয়া' নাটকটি।

অমল নাথ:

অমল নাথ ছন্দম এর একজন বিশিষ্ট শিল্পী ছিলেন। অমলনাথ সৎ পরিশ্রমী, নিয়মনিষ্ঠ ও যথার্থ শিল্পী ছিলেন। তাঁর আলোয় আলোকিত হয়েছেন অনেক অভিনেতা-অভিনেত্রী, যদিও মঞ্চের আলোয় অভিনয় করেননি তিনি। পরিমিতিবোধ তাঁর এত নিখুঁত ছিল যে সূক্ষাতিসূক্ষ্ম যন্ত্রেও বোধহয় তা মাপা যেত না। বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান পিপাসা তাঁকে এত সমৃদ্ধ করেছিল যে একটা

অতিসাধারণ জিনিস, তাঁর হাতের স্পর্শে অসাধারণ হয়ে উঠত। নাটক পাঠের শুরুতেই শুরু হত তাঁর আলোকে-পরিকল্পনা। কোথায়, কখন, কীভাবে আলোর প্রয়োগে একটি চরিত্র বা পরিবেশ পরিস্থিতিকে নিখুঁতভাবে সে ব্যাপারেও তিনি ফুটিয়ে তুলতেন। 'আজকের হ্যামলেট', 'ফেরারী ফৌজ', 'নীলদর্পণ', 'ফুলমোতিয়া', 'যতীনবাবুর চাকর', 'পদ্য গদ্য প্রবন্ধ' প্রভৃতি নাটককে তিনি আলোক সম্পাত করে আলোকিত করেছেন। তিনি প্রযুক্তিজ্ঞানই- নতুন ছন্দম মঞ্চকে করে তুলেছে স্থায়ী বিজ্ঞানসম্মত মঞ্চ। তাঁর কোন প্রথাগত শিক্ষা ছাড়াও তিনি একজন পরিপূর্ণ শিল্পী হয়ে উঠেছিলেন। তাই অমল নাথ ছন্দম মঞ্চের একজন নির্ভরশীল ও যত্নবান শিল্পী (আলোক সম্পাত) ছিলেন।

মহিলা চরিত্র:

ভারতী গুপ্ত:

মফস্বল শহরের নাট্যজগতে মহিলা শিল্পী বরাবরই এমনকি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে কাউকেই অভিনয় জগতে আসতে দেখা যায়নি। তবে একটি ব্যতিক্রমী চরিত্র হল ভারতী সেনগুপ্ত। রায়গঞ্জ মঞ্চে অভিনয়ের মধ্য দিয়ে খুব অল্প বয়স থেকেই অভিনয় শুরু করেন। তিনি রামেন্দ্রপল্লী পূজা প্রাঙ্গনের মঞ্চে প্রথমে অভিনয় করতেন, তার কিছুকাল রায়গঞ্জ ইনস্টিটিউটে এবং শুরু থেকে অভিনয় করে চলেছেন 'ছন্দম' নাট্য সংস্থাতে। রায়গঞ্জের পরিসর অতিক্রম করে অভিনেত্রী হিসাবে তার খ্যাতি বিস্তৃত। তিনি রায়গঞ্জ গার্লস স্কুল থেকে পাশ রকরে রসায়নে সান্মানিকসহ স্নাতক হয়ে শিক্ষকতা করেছেন দীর্ঘকাল। ভারতী গুপ্ত ছিলেন সতীশচন্দ্র গুপ্তের কনিষ্ঠ কন্যা। বর্তমান নিবাস রায়গঞ্জের রমেন্দ্রপল্লীতে। ১৯৮৩ সালে 'ফুলমতিয়া' নাটকে অভিনয়ের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীর 'দিশারী' পুরস্কারে ভূষিত হয়েছিলেন।

গীতা ব্যানার্জী:

গীতা ব্যানার্জী একজন নম্র, ধৈর্যশীল ও বিনয়ী অভিনেত্রী ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'শান্তি' নাটকে 'বড়োবউ' চরিত্রে অভিনয় দর্শকের মন জয় করেছিল। কাবুলীওয়ালার মিনির মা তাঁর ছন্দম-এ ঢোকার ঠিক আগের অভিনয়। 'ছেঁড়াতার' এর 'বুড়ি মা', 'নীলদর্পণ'-এর আদরী সবেতেই তিনি স্বচ্ছন্দ স্বাভাবিক। রুপোলি চাঁদ, 'নাট্যকারের সন্ধানে দুটি চরিত্র', গেটম্যান, আবর্ত প্রভৃতি নাটকে তিনি অভিনয় করেছেন। তাঁর অভিনয় যেমন আকৃষ্ট করত, তেমনি তাঁর মধুর ব্যবহার ও চরিত্রে সাবলীল অভিনয় সকলে মুগ্ধ করত।

কৃষ্ণা সেনগুপ্ত:

কৃষ্ণা সেনগুপ্ত ওরফে 'টুলটুল' ছিলেন প্রতিভাময়ী অভিনেত্রী। 'শেষ থেকে শুরু' নাটক

দিয়ে কৃষ্ণা সেনগুপ্তে আগমন ঘটে ছন্দমে। তিনি প্রথম থেকেই সকলের মন জয় করে নিয়েছিলেন। আবর্ত, অগ্নিগর্ভ লেনা, নাট্যকারের সন্ধানে ছটি চরিত্র, রূপোলি চাঁদ, শাস্তি, নীলদর্পণ, ফেরারী ফৌজ' প্রভৃতি নাটকে তাঁর অভিনয় প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গেছেন। যখনই যে চরিত্রে অভিনয় করেছেন তখনই সেটাকে সেরা বলে মনে হয়েছে। তিনি খুব ভাল গান করতে পারতেন। এভাবেই সঙ্গীত তাঁর নাট্যক্ষমতাকে উন্নীত করেছিল।

নজমু নাট্যনিকেতন:

নজমুল হক:

উত্তর দিনাজপুর জেলার একজন যথেষ্ট প্রসিদ্ধ ও মর্যাদাপূর্ণ পরিচালক, সংগঠক ও অভিনেতা হিসেবে নজমুল হকের নাম উল্লেখ করা যায়। কালিয়াগঞ্জ তথা সমগ্র দিনাজপুর (স্বাধীনতার পূর্বে জেলায় নাটকের প্রসারে তাঁর অবদান শ্রদ্ধা সহকারে স্মরণ করতে হয়। নজমু হক সাহেবের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ও সুরেন্দ্রনাথ, মহেন্দ্রনাথ ও যোগেন্দ্রনাথ, ভদ্র ভ্রাতৃগণের নিঃস্বার্থদানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল 'নজমু নাট্য নিকেতন'। ১৯৪২ সাল পর্যন্ত তিনি এই জগতে কাজ করে গেছেন। সেই সময় সামাজিক নাটক তেমন হত না। ('স্বর্ণলতা' নাটকটি ছাড়া)। ঐ যুগে ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক নাটকই বেশি অভিনীত হয়েছিল। বেশিরভাগ নাটকেই প্রধান ভূমিকায় অভিনয় করতেন নজমু হক মহাশয়। তাঁর অভিনীত উল্লেখযোগ্য নাটকগুলির মধ্যে— 'বঙ্গে বর্গী', 'ভাস্কর পণ্ডিত' যা সেই সময় নাট্যদর্শকদের মধ্যে আলোড়ণ সৃষ্টি করেছিল এবং সুউচ্চ প্রশংসা লাভ করেছিল।

অশ্বিনী পাট্টাদার:

'নজিমুল নাট্য নিকেতন'-এর একজন বিদগ্ধ শিল্পী অভিনেতা ও গল্পকার ছিলেন অশ্বিনী পাট্টাদার। তিনি সেই সময় অভিনয় করে যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দেন ও খ্যাতি অর্জন করেন। ঐ যুগে পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক নাটকই অভিনীত হয়েছে। সামাজিক নাটক তেমন হয়নি। আর ডে-লাইট ও হ্যাজাক এ নাটকগুলি অভিনীত হত। বাণীকুমারের 'সন্তান' নাটকটিতে অভিনয় করে তিনি দর্শকদের মন জয় করেছিলেন। 'ক্ষুদিরাম' নাটকে ক্ষুদিরামের ফাঁসির দৃশ্যে, সীতা নাটকে সীতার পাতাল প্রবেশ দেখে, নাট্য দর্শকরা তাদের চোখের জল ধরে রাখতে পরেননি। 'পার্থ সারথী' নাটকেও তাঁর অভিনয় যথেষ্ট আলোড়ণ সৃষ্টি করেছিল।

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার উল্লেখযোগ্য ও স্বনামধন্য নাট্যব্যক্তিত্বের পরিচয়:

বালুরঘাট নাট্যমন্দির:

অবিভক্ত দিনাজপুর জেলার নাট্যচর্চার সুমহান ও সুসংবদ্ধ ঐতিহ্য ছিল। বিভাগোত্তর পশ্চিম

দিনাজপুরে বালুরঘাট মহকুমা শহরে নাট্যমন্দির প্রতিষ্ঠালগ্ন ১৯০৯ খ্রি: থেকে সেই ঐতিহ্যপূর্ব নাট্যচর্চার ধারাকে দায়িত্বের সঙ্গে একাই বহন করেছে। তাই সারা উত্তরবঙ্গের নাট্য আন্দোলনে বালুরঘাট নাট্যমন্দিরের অবদান ও গুরুত্ব বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ও প্রশংসনীয়। এই নাট্যমন্দিরের প্রাচীন ঐতিহ্যময় নাট্যচর্চার সূত্র ধরে সুদক্ষ বাংলাখ্যাত নাট্যকার, অসংখ্য প্রতিভাসম্পন্ন নাট্য-অভিনেতা ও অভিনেত্রী খ্যাতনামা নাট্য-পরিচালক ও নাট্যকর্মী উঠে এসেছিলেন, যারা উত্তরবঙ্গ সহ বাংলা তথা ভারতবর্ষের ব্যাপী স্বমহিমায় খ্যাতি ও প্রশংসা লাভ করে দিনাজপুরের নাট্যচর্চার ধারাকে গৌরবের আসনে অলংকৃত করে কৃতিত্বের স্বর্ণ শিখরে অধিষ্ঠিত করেছিলেন। এই নাট্যসংস্থা আজও নাট্যচর্চার ধারায় বহমান থেকে অসংখ্য নাট্যশিল্পী তথা অভিনেতা-অভিনেত্রী, নাট্যপরিচালক ও নাট্যনির্দেশক এবং নাট্যকর্মী তৈরি করে নাট্যানুশীলনের মধ্য দিয়ে তাদের গুণমানে উপযোগী করে তুলছেন। এই নাট্যসংস্থার প্রাক্‌স্বাধীনতা পর্বের ও স্বাধীনোত্তর পর্বের অসাধারণ দক্ষ ও বিশেষ কৃতিসম্পন্ন অভিনেতা অভিনেত্রী, নাট্য-পরিচালক ও নির্দেশক এবং নাট্যকর্মীদের সুসমৃদ্ধ অভিনয় সম্বন্ধে যথাযথ বিবরণ লিপিবদ্ধ করছি।

নরেশ বন্দ্যোপাধ্যায় :

তিনি বালুর নাট্যমন্দিরের প্রতিষ্ঠা লগ্নের বিশিষ্ট ও প্রধান নাট্যব্যক্তিত্ব, এবং ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি এই নাট্যসংস্থার সম্পাদক পদে অধিষ্ঠিত হন। সেই সঙ্গে তিনি পেশায় ছিলেন স্বনামধন্য আইনজীবী। কিন্তু অভিনেতা হিসাবে তিনি ছিলেন বালুরঘাট তথা জেলার সেই সময়ে অনেক নাট্যশিল্পীদের Role model। তাঁর চেহারা ছিল খুবই সাধারণ গোছের। কিন্তু তাঁর কণ্ঠস্বর ছিল আশ্চর্যভাবে ভরাট ও নিখুঁত উচ্চারণ। সে সময়ে বাচিক অভিনয়ের সর্বজন গ্রাহ্য একটা মান্যতা লক্ষ করা যায়। তিনি ছিলেন মূলত: একজন Versatile Actor। বিভিন্ন চরিত্রে তাঁর স্বাচ্ছন্দ্য, অনায়াস অভিনয়গুণে দর্শককে মুগ্ধ করে তুলতো। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, 'তটিনী বিচার' নাটকে Mr. Bose 'মানময়ী গালর্স স্কুল'-এ প্রথমে ফিরিঙ্গি সাহেব, পরে কর্তা অর্থাৎ মানময়ীর স্বামী 'কেদার রায়' নাটকে কার্ভালো, চন্দ্রগুপ্ত -এ চাণক্য ছাড়াও আরও অন্যান্য নাটকের অনেক চরিত্রে তাঁর অসামান্য অভিনয় তৎকালে দর্শকদের আপ্লুত করে তুলেছিল।

মূলত Stage Management-এর লোক হিসেবে কাজ করতেন এছাড়া অভিনয়ও করতেন। তবে তুলনামূলকভাবে খুবএকটা উল্লেখযোগ্য অভিনেতা ছিলেননা।

শান্তিরঞ্জন গুহ (ছানাদা):

তিনি প্রথমপর্বে নারী চরিত্রে অভিনয় করতেন। মাটির ঘরে স্ত্রী ভূমিকায় ভালো অভিনয়

করেছেন। মেঘ মুক্তিতেও নায়িকার অভিনয় করেছেন। তার গায়ের রং ফর্সা এর ছিপছিপে চেহারা ছিল। পরবর্তীতে তিনি Seriocomic Actor হিসেবে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেন।

ছানাদার একটি অন্যতম গুণ হল স্বচ্ছন্দে অনায়াসে সংলাপ বলতে পারা। Reflex fluid tongue এ জলভাতের মতো সংলাপ বলতে পারতেন। 'ফেরারী ফৌজ' নাটকে তাঁর অভিনয় সকল দর্শককে মুগ্ধ করেছিল। 'ফেরারী ফৌজ' নাটকে শান্তি রায় চরিত্রটির প্রথম পর্বে খুবই চমৎকার অভিনয় করেছেন। ছানাদার বেশি কৃতিত্ব মূলত ত্রিতীর্থ। ছানাদা যে কত বড় মাপের অভিনেতা ছিলেন তা শ্রদ্ধেয় বিজন ভট্টাচার্য, এবং কলকাতার নানান সমালোচকদের প্রশংসা থেকেই প্রমাণিত হয়।

সুবোধ মুখোপাধ্যায় (ফনী):

নাট্যমন্দিরের প্রতিষ্ঠা পর্বের প্রথম সারির ও বর্ষীয়ান সুদক্ষ অভিনেতা। (উদাহরণ কালিন্দী নাটকের আর এক মুখ্য চরিত্রটিতে অর্থাৎ ইন্দ্রনারায়ণ-এর ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন সুবোধ মুখোপাধ্যায়। চারপ্রহর নাটকে অসামান্য অভিনয় অভিনয় করে বহু প্রশংসিত হন) তিনি Deep Baritone voice-up stage-এ স্বাভাবিক গলায় সংলাপ বললেও দর্শকদের কর্ণগোচর হত। সুবোধ মুখোপাধ্যায় ভীষণ Versatile Actors ছিলেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায় চক্‌মকিতে কিপটে বুড়ো, কালিন্দী' তে ইন্দ্রনারায়ণ, 'খনা'-তে বরাহমিহির প্রভৃতি ভূমিকায় তাঁর অসামান্য অভিনয় দর্শকদের কাছে প্রশংসিত হয়ে তিনি অনেক নাটকের অভিনয়ে যথেষ্ট সুনাম ও খ্যাতি অর্জন করেন।

হরিমাধব মুখোপাধ্যায়:

ভালোবাসা ও ভালোলাগা থেকেই নাটকে আগমন ঘটে হরিমাধব মুখোপাধ্যায়ের। এই ভালোলাগা থেকেই জন্ম নেয় নাটকের প্রতি প্রবল আকর্ষণ। শৈশবে হৃদয়াবেগই মানুষকে চালিত করে। আর তারই প্রবল টানে নাটকের জগতে ঢুকে পড়লেন তিনি। যেখানেই নাটক সেখানেই তিনি যেতেন। এরই মাঝে তিনি বালুরঘাটে তরুণতীর্থ নামে নাট্যদল গড়ে তোলেন। ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় চলে গেলেও নাটকের পরিকল্পনা করতেন। এরপর বালুরঘাটে ফিরে এসে তরুণতীর্থকে নতুন ভাবে শুরু করলেও এরপর বালুরঘাটে ফিরে এসে তরুণতীর্থকে নতুনভাবে শুরু করলেও তিনি নাট্যমন্দিরের অনেক অভিনেতার সঙ্গে পরিচিত হন। দেবল রায়, প্রভাস সমাজদার, দ্বিজপদ সাহা প্রমুখ ছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম যাদের ইচ্ছায় তিনি নাট্যমন্দিরের সদস্যপদ গ্রহণ করেন। নাট্যমন্দিরে হরিমাধব মুখোপাধ্যায়ের প্রথম নাটক ছিল 'অমৃতস্য পুত্রা'। তিনি এই নাটকটিতে অভিনয় না করলেও তিনি পরিচালনা করেছেন। এই নাটকটিতে তিনি নোটেশন দিয়েছিলেন লৌহপ্রাচীর, অমৃত অতীত, ছায়ানায়িকা, চারপ্রহর, কেয়াকুঞ্জ প্রভৃতি নাটকে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে

পরিচালনা করেছেন। এছাড়াও চারপ্রহর, লৌহপ্রাচীর, অমৃতঅতীত প্রভৃতি নাটকে অভিনয় করেছেন। পরবর্তীকালে নানা কারণে নাট্যমন্দির ত্যাগ করলেও হরিমাধব মুখোপাধ্যায় নাট্যমন্দিরের সম্মান যথেষ্ট উঁচুতে তুলে দিয়েছেন।

অমিতাভ সেন (দুলু):

বালুরঘাটের একজন প্রসিদ্ধ নাট্যকার হলেন অমিতাভ সেন ওরফে দুলু। তিনি গুরু জিতেন সেনের আদেশে বালুরঘাট নাট্যমন্দিরে যোগ দেন। ছোটোবেলা থেকে আবৃতি করার জন্য তিনি বেশ কতগুলি গুণ অর্জন করতে পেরেছিলেন। তিনি বালুরঘাট নাট্যমন্দিরে প্রায় ১৮ বছর ধরে অভিনয় করে দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি ত্রিতীর্থের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হয়ে ওঠেন এবং এখানে 'তিন বিজ্ঞানী', 'শের আফগান', 'নাট্যকারের সন্ধানে দুটি চরিত্র', 'অমৃতস্যপুত্রাঃ' প্রভৃতি নাটকে অভিনয় করেছিলেন।

সনৎ:

বালুরঘাট নাট্যমন্দিরের প্রচণ্ড ক্ষমতাবান অভিনেতা ছিলেন। বালুরনাট্যমন্দির উদ্যোগ নিয়ে হাওড়ার অনুষ্ঠিত একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতায় 'তাহার নামটি রঞ্জনা' ও 'কালোমাটির কান্না' নাটকদুটি প্রযোজনা করেন। সেই নাটকে জেলার হয়ে সনৎ সেন বেস্ট অ্যাক্টরের পুরস্কারে সম্মানীত হন। বালুরঘাট নাট্যমন্দির বেস্ট ড্রামা সিলেকশনে সম্মান অর্জন করে। এই নাটক দুটিতে সনৎ-এর অভিনয় ছিল তুলনারহিত। এছাড়াও তিনি আরও বেশ কিছু নাটকে তাঁর অভিনয় প্রতিভার দক্ষতার পরিচয় দিয়ে দর্শক সমাজে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করতে সমর্থ হয়েছিলেন এবং জেলাসহ সমগ্র উত্তরবঙ্গে যথেষ্ট পরিচিতি লাভ করেন।

সত্যরঞ্জন তালুকদার:

বালুরঘাটের নাট্যজগতের একজন বিশিষ্ট নট ও নাট্যকার হলেন সত্যরঞ্জন তালুকদার। নাট্যকার সত্যরঞ্জন মহাশয় ছিলেন একজন প্রকৃত সৃজনশীল ব্যক্তি। বিদ্যালয়ে নাটক মঞ্চস্থ করার জন্য তিনি নিজেই নাটক লিখতেন। তিনি ছাত্রছাত্রীদের সত্যরঞ্জনবাবু একজন মহিলা চরিত্রে শিল্পী হিসেবে যথেষ্ট স্বীকৃত ও প্রশংসিত হয়েছিলেন। ১৯৮০ সাল পর্যন্ত তিনি ত্রিতীর্থের সদস্য ছিলেন, গ্যালিলিও, দেবীগর্জন, অমৃতস্যপুত্রা প্রভৃতি নাটকে তার অভিনয় সকলকে মুগ্ধ করেছিল। 'নতুন আলো' নামক একটি একাঙ্ক নাটক করেছিলেন সেটি শিলিগুড়ির বেতারকেন্দ্র থেকে সম্প্রচারিত হয়েছিল। যদিও এই নাটকটি মুদ্রণ সৌভাগ্য লাভ করেনি। বালুরঘাটের সর্বজন শ্রদ্ধেয় নাট্য ব্যক্তিত্ব শ্রীযুক্ত হরিমাধব মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতি চারণে পাই— ''ভাঙা পটে' তাঁর মাস্টার অভিনয় অনুকরণীয় অনবদ্য ও অপূর্ব হয়েছিল।

প্রভাস সমাজদার:

প্রভাস সমাজদার বালুরঘাট নাট্যমন্দির-এ প্রবেশের মাধ্যমে নাট্যজীবন শুরু করলেও পরবর্তীকালে তিনি ত্রিতীর্থ নাট্যদলে যোগ দেন। ত্রিতীর্থে তাঁর প্রথম নাটক ছিল 'খনা'। এরপর তিনি ত্রিতীর্থতে— রূপালি চাঁদ, ফেরারী ফৌজ, ক্ষুধা, দমকল প্রভৃতি নাটকে যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। ত্রিতীর্থ নাট্যসংস্থার তিনি একজন প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিলেন। প্রভাসবাবু একটি নাটক পরিচালনা করেছিলেন— 'ছায়ানট', ত্রিতীর্থতে তাঁর উল্লেখযোগ্য নাটকগুলি হল— পরবাস, বিজ্ঞাপন, দেবীগর্জন, পুতুলখেলা প্রভৃতি।

অমলেশ মিত্র:

বালুরঘাটের একজন সহজাত অভিনয়ের অধিকারী কল্পনাপ্রবণ, অভিনেতা ও পরিচালক ছিলেন অমলেশ মিত্র। তাঁর শরীর ও সংলাপ মিলেমিশে যেন এক হয়ে যেত প্রতিটি নাটকে। ১৯৬৪ সালে অমলেশ মিত্র নাট্যমন্দিরে যোগদান এবং প্রথম দিকে— ক্ষুধিত পাষাণ, কাবুলিওয়ালা, আখের স্বাদ নোন্‌তা প্রভৃতি নাটকে অভিনয় করে নাট্যদর্শকদের আনন্দ দিয়েছিলেন। প্রথম দিকে বিভিন্ন কমিক চরিত্রে (যেমন ঝুমুর নাটকে ফটকে চিরত্র) অভিনয় করলেও, প্রধান বা নায়ক চরিত্রে (যেমন ছেঁড়াতার নাটকে রহিমুদ্দিন) সমান দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। পাটনায় অনুষ্ঠিত 'সর্বভারতীয় পূর্ণাঙ্গ বাংলা নাটক প্রতিযোগিতা'য় ১৯৭০ সালে 'ছেঁড়াতার' নাটকটি বেশ প্রশংসিত হয়েছিল। পরবর্তীকালে তিনি 'প্রদোষে প্রভাত', 'কেউ কথা রাখে না' ইত্যাদিতে অভিনয় করে সাড়া ফেলে দিয়েছিলেন। অন্যান্য নাটকগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য-মারীচ সংবাদ, রাজদর্শন, মমতাময়ী হাসপাতাল, অমৃত অতীত, রাজদর্শন, অগ্নিগর্ভ হেকিমপুর ও পরান মণ্ডলের ঘরগেরস্থি ইত্যাদি।

সদু তরফদার:

বালুরঘাট নাট্যমন্দিরের একজন সুনামী অভিনেতা ছিলেন। তিনি এক সুন্দর চেহারার অধিকারী ছিলেন। তাই তিনি নাটকে নায়কের ভূমিকায় অভিনয় করতেন। এইজন্য তিনি নাটকে নায়কের ভূমিকা পেতেন। এছাড়া তিনি অন্যান্য চরিত্রেও অভিনয় করে দর্শকদের মুদ্ধ করতেন। বিশেষ করে 'কালিঙ্গী' নাটকে 'ডগরু' চরিত্রে তাঁর অভিনয় বেশ প্রশংসনীয় হয়েছিল। এমনকি দর্শক মহলে আজও তিনি স্মরণীয় হয়ে আছেন।

গিরীশ সাহা :

খুব অল্প বয়সেই প্রসিদ্ধ নাট্যঅভিনেতা ও নাট্যনির্দেশক গিরীশ সাহা নাট্যমঞ্চে অবতীর্ণ হন। কচিকলা একাডেমি'তে নাটক পরিচালনায় মহড়া দিতেন এবং প্রয়াত গবিন্দ তালুকদারের কাছে নাট্যশিক্ষা নিতেন। সেই সময় তিনি থানা থেকে আসছি, রক্তে রোয়া ধান, বৌদির বিয়ে,

বিংশ শতাব্দী, প্রস্তাব ইত্যাদি নাটকে অভিনয় করেন। এরপর তিনি 'অভিযাত্রী'তে যোগদেন এবং সেখানে মঞ্চস্থ করেন— টিনের তলোয়ার, আমি এ চাইনি, ক্যাপ্টেন হুরবা প্রভৃতি। বালুরঘাট নাট্যমন্দিরের সাথে যুক্ত হন ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে। এখানে তিনি তীর্থযাত্রী, শাস্তি, রাজদর্শন, জীবনদর্পণ, অমৃতঅতীত, সমুদ্র সন্ধানে, আমার মাটি প্রভৃতি নাটকে অভিনয় করে নাট্যদর্শকদের মুগ্ধ করে দিয়েছিলেন। ১৯৭৫ সালে 'লিট্‌ল থিয়েটার গ্রুপ' তৈরি করেন। বালুরঘাটের নাট্যজগতে গিরিশ সাহা মহাশয়ের অবদান ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে। তিনি বিভিন্ন ক্লাব ও পাড়ার নাটকেও অভিনয় করেছেন।

অচিন্ত্যকৃষ্ণ গোস্বামী:

অধ্যাপক অচিন্ত্যকৃষ্ণ গোস্বামী ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে থেকে বালুরঘাটের নাট্যচর্চায় মুগ্ধ হয়ে বালুরঘাট নাট্যমন্দিরে অংশ গ্রহণ করেন এবং এই নাট্যসংস্থার সম্পাদকের পদে আসীন হয়েছেন। তখন ছোট শহরের গণ্ডি পেরিয়ে জেলার সর্বত্রই এই বাঁধানো মঞ্চে অসংখ্য দর্শকের অদম্য উৎসাহে নাটক মঞ্চস্থ হয়। তিনি অফুরন্ত প্রাণশক্তি, আড্ডাবাজ প্রিয় এবং সাংগঠনিক কাজে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। সেই সঙ্গে তাঁর নাট্যসাহিত্যের প্রতি গভীর টান লক্ষ করা যায়। তাঁর সদিচ্ছা উদ্যোগ ও সক্রিয় প্রচেষ্টায় লক্ষ্ণৌ, পাটনায় পূর্ণাঙ্গ নাট্য প্রতিযোগিতায় একাধিকবার অংশগ্রহণ করে বালুরঘাট নাট্যমন্দির সাফল্যের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়ে সর্বভারতীয় পুরস্কারে অলঙ্কৃত হয়। তাই বালুরঘাট নাট্যমন্দিরের নাট্যচর্চায় ক্ষেত্রে তিনি চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন। নাটক দিয়ে তাঁর মতো চিন্তাভাবনা, ইচ্ছাশক্তি বালুরঘাটের নাট্যজগতে ক্রিয়াশীল থাকার ফলে নাট্যমন্দির বেশ সমৃদ্ধির পথে অগ্রসর হয়েছিল।

প্রণব চক্রবর্তী:

প্রণব চক্রবর্তী ছিলেন বালুরঘাট নাট্যমন্দিরের একজন পরিবার সংস্কৃতি জগতের সঙ্গে যুক্ত ছিল বলে তিনিও খুব তাড়াতাড়ি নাটকের কাছাকাছি আসতে পেরেছিলেন, দাদা আনন্দমোহন চক্রবর্তী নাট্যমন্দিরের একজন অভিনেতা হয়ে ওঠায় তিনি এর নিয়মতি দর্শক ছিলেন। এবং তিনি স্বাভাবিকভাবে নাট্যমন্দিরের সদস্য হন। পরবর্তীকালে প্রণব চক্রবর্তী নাট্যমন্দিরের পরিচালনা সমিতির সদস্য সাংস্কৃতিক সম্পাদক এবং শেষে সাধারণ সম্পাদকের পদ লাভ করে দায়িত্বের সঙ্গে পালন করেছিলেন। তিনি লালন ফকির নাটকে লালনের ভূমিকায় অভিনয় করে যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিয়ে সুনাম অর্জন করেছিলেন। এছাড়াও 'লৌহ কপাট' নাটকেও তিনি অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করে বেশ প্রশংসিত হন।

দীপক রক্ষিত:

বালুরঘাট নাট্যমন্দিরের প্রভাবশালী অভিনেতা ও স্বনামধন্য পরিচালক দীপক রক্ষিত। নাট্যমন্দিরে যোগদান করেন ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে। সেই সময় তিনি নাট্যমন্দিরে— সোনার হরিণ, ঝুমুর (পার্শ্বচরিত্র), বিড়িয়ালা বৃদ্ধ, সকলের জন্য নীলাঞ্জ প্রভৃতি নাটকে অভিনয় করে সকল দর্শকবৃন্দকে মুগ্ধ করেছিলেন। এরপর দীপক রক্ষিত সহ পরিতোষ দাস, দেবব্রত চক্রবর্তী, দেবল রায় সকলে মিলে অভিযাত্রী নাট্যসংস্থায় যোগ দেন। যেখানে দীপক রক্ষিত যে সকল নাটক গুলি করেছিলেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ক্যাপ্টেন হুরবা (ক্যাপ্টেন চরিত্রে), আমি এ চাইনা, টিনের তলোয়ার প্রভৃতি নাটকে বেশ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। কিছুকাল পর তিনি পুনরায় নাট্যমন্দির-এ ফিরে এলেন। এখানে তিনি যেসব নাটকে অংশ নিয়েছিলেন সেগুলি হল— সূর্য শিকার (পরিচালক ও অভিনেতা), জুলিয়ার্স ফুচিক (পরিচালক ও নাম ভূমিকায় অংশ নিয়েছিলেন), সজান বাগান (পরিচালক ও অভিনেতা) এবং দানসাগর নাটকে পরিচালক ছিলেন। এইভাবে তিনি একাধিক নাটকে পরিচালনা ও অভিনয় করে নাট্যমন্দির যথেষ্ট উঁচু স্থানে পৌঁছে দিয়েছিলেন। জীবনের শেষ পর্বে এসে তিনি পুনরায় নাট্যতীর্থে ফিরে যান। নাট্যতীর্থে ফিরে এসে তিনি অগ্নিগর্ভ ও মণ্ডলের ঘর গেরস্থী নাটকে অভিনেতা ও পরিচালকের ভূমিকা পালন করেছেন। এছাড়াও কালাবন্দর (অভিনেতা ওপরিচালক) কানামামা (অভিনয় ও পরিচালক), দানসাগর (পরিচালক), সাজান বাগান (পরিচালক) ও ফস্টাস (মঞ্চ, পরিচালক ও পোষাক) নাটকে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন।

প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়:

বালুরঘাট নাট্যমন্দিরের প্রথম পর্বের দক্ষ অভিনেতা ও সুশাসক ছিলেন। প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায় প্রথম অভিনয় শুরু করেন নাট্যমন্দিরে পি. ডব্লু.ডি নাটকে। এই নাটকের ডাইরেক্টর ছানাদা- সৌমেন চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন আর তিনি নিজে মেয়ে চরিত্রের (অঞ্জলি) মধ্য দিয়ে অভিনয় করা শুরু করেন। তিনি নানা ধরনের চরিত্রে অবতীর্ণ হয়ে যথেষ্ট খ্যাতি ও প্রশংসা অর্জন করেন। সেই সময় ৫০-দশকে প্রথম সারা জাগানো নাটক 'গণশার বিয়ে'তে প্রণববাবু গণশা-তোঁতলা চরিত্রে অভিনয় করে বেশ সুনাম অর্জন করেন। এরপর তিনি 'নীলদর্পণ' নাটকেও অভিনয় করেন। সেখানে তিনি দেওয়ান চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন। 'ঝুমুর' নাটকেও তিনি সুর দান করে নাটকটিকে মঞ্চ সফলতা দানে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। 'নটীবিনোদিনী' নাটকে প্রণব কুমার মুখোপাধ্যায় গিরিশ ঘোষের ভূমিকায় অভিনয় ও গান পরিবেশন করে দর্শকদের মুগ্ধ করে তুলেছেন। 'সূর্য শিকার' এ সমুদ্রগুপ্ত চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন ঝন্টুবাবু আর সুরদান করেছিলেন প্রণব কুমার

মুখোপাধ্যায় এছাড়াও তিনি 'আমার মাটি', 'বৃষ্টি বৃষ্টি' প্রভৃতি নাটকেও অভিনয় করেছেন। বেঙ্গলি ক্লাবের সারা ভারত ড্রামা কম্পিটিশনে লক্ষ্ণৌ গিয়েছিলেন 'ফেরা' নাটকটি অভিনয় করতে। এই নাটকে তিনি দ্বিতীয় বেস্ট অক্টর-এর পুরস্কারে সম্মানিত হন। তিনি 'ছেঁড়াতার' নাটকে সঙ্গীত পরিবেশন করে সুনাম অর্জন করেছিলেন। হাওড়ার একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতায় বালুরঘাট নাট্যমন্দিরের প্রযোজিত নাটক 'তাহার নামটি রঞ্জনা' ও 'কালো মাটির কান্না' নাটকে তিনি 'Best site Actor-এর পুরস্কারে পুরস্কৃত হন। এছাড়াও তিনি তারাশংকরের 'গণদেবতা' নাটকের মূল চরিত্র দেবু ঘোষের ভূমিকায় অসাধারণ অভিনয় রকরে সুনাম অর্জন করেছিলেন।

শিবপ্রসাদ কর:

বালুরঘাট নাট্যমন্দির নাট্যকৃতিত্বের জন্য চিরকালই বিখ্যাত ও স্মরণীয় ছিল। এই নাট্যসংস্থার স্বাধীনোত্তর পর্বের প্রথম সারির অন্যতম ও উল্লেখযোগ্য কীর্তিস্তম্ভ ছিলেন শিবপ্রসাদ কর। তিনি শুধু অভিনেতা রূপে নয়, নাট্যকার রূপেও। ১৯৫৬-৫৭ খ্রিস্টাব্দে মহিলা নাট্যশিল্পীদের নিয়ে বালুরঘাট নাট্যমন্দিরে 'কালিন্দী' নাটকের মহড়া শুরু হয়, যা বালুরঘাটের নাট্যজগতে এক বৈপ্লবিক ঘটনা হিসেবে পরিচিত লাভ করে। উত্তরবঙ্গের সীমান্ত ঘেষা সদর মহকুমা বালুরঘাটের ছোট শহরে অবশেষে 'কালিঙ্গী' মহাসমারোহে মঞ্চস্থ হয়। এই নাটকে রামেশ্বরের ভূমিকায় দিনাজপুর ড্রামাটিক ক্লাবের বিখ্যাত নট শিবপ্রসাদ কর অভিনয় করলেন। তিনি অভিনেতা হিসেবে ছিলেন কিংবদন্তী। স্বয়ং তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় দুইপুরুষ নাটকে নটু বিহারীর চরিত্রে তাঁর অনবদ্য অভিনয় দেখে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিলেন। শিবপ্রসাদ স্পষ্ট উচ্চারণ, বঞ্চিত অভিব্যক্তি, পিওন, স্বরক্ষেপনে ঈর্ষণীয় দক্ষতা ও পারদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন। শুধু তাই নয় তিনি অনায়াসে নাট্যমঞ্চে প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করতে পারতেন। প্রথমে মঞ্চাভিনেতা ও পরবর্তীতে স্বনামধন্য চিত্র পরিচালক রাজেন তরফদার ছিলেন তাঁর মন্ত্রশিষ্য। এই চিত্রপরিচালক রাজেন বাবু গঙ্গা ছবির মূল বৃদ্ধাটির চরিত্রের ভূমিকায় অভিনয়ের জন্য তাঁকে নির্বাচন করলে শারীরিক অক্ষমতার জন্য তিনি রাজেনবাবুর এই ইচ্ছা পূরণ করতে সক্ষম হননি। সেই সময়ে শিবপ্রসাদ কর উত্তরবঙ্গের নাটক মহলে ছিলেন সবার নমস্য এমনকি অনেকেরই role model। তাঁর রচিত পৌরাণিক নাটক স্বর্ণলঙ্কা, কলকাতার নাট্যনিকেতন ও সগৌরবে অভিনীত হয় এবং ঐতিহাসিক 'প্রতিষ্ঠা' নাটকটি উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন মঞ্চে সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয়ে প্রশংসিত ও সুউচ্চ প্রশংসা লাভ করে। ১৯৫৫ খ্রি: আঞ্চলিক নাট্যপ্রতিযোগিতায় হয়েছিল সমগ্র মুর্শিদাবাদ, পশ্চিম দিনাজপুর ও মালদা জুড়ে। বালুরঘাট নাট্যমন্দির 'কালিন্দী' নাটকটি মঞ্চস্থ করার সিদ্ধান্ত নেয় এবং কেন্দ্রীয় চরিত্রের দায়িত্ব দেওয়া হয় শিবপ্রসাদবাবুকে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করেই সমগ্র বালুরঘাট মেতে উঠল আনন্দে আর অভিনেতাদের

মধ্যে শ্রেষ্ঠ হলেন শিবপ্রসাদ কর। এই ঘটনা আজো নাট্যপ্রেমী জনসাধারণের মনে আনন্দ জোগায়।

অমিয় সেন:

স্বাধীনতা লাভের সুবাদে দেশবিভাগের পর দিনাজপুর ড্রামাটিক ক্লাবের কিছু যশস্বী ও দিকপাল অভিনেতা স্বাভাবিক কারণে অখণ্ড বা বৃহত্তর দিনাজপুর থেকে এসে সদর শহর বালুরঘাটে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন এবং নাট্যমন্দিরে যোগদান করেন। এদের মধ্যে-অমিয় সেন ছিলেন অন্যতম ও সুদক্ষ অভিনেতা তথা নাট্যপরিচালক। অমিয় সেনের স্বাধীনতার অব্যবহিত পরবর্তী সময়পর্বে বালুরঘাট নাট্যমন্দিরের সুবর্ণযুগ এবং একচ্ছত্র আধিপত্যে নাট্যতীর্থ হয়ে উঠেছে। অমিয় সেন এই সময় বালুরঘাট নাট্যমন্দিরের পরিচালকের দায়িত্বে যথেষ্ট দক্ষতার সঙ্গে পরিপালন করেছিলেন অকৃতদার এই মানুষটি পেশার কারণে চাকুরির সময় টুকু ছাড়া অধিকাংশ সময়ে— নাট্যচিন্তায় মগ্ন থাকতেন। তাঁর মতো উদার, নির্লোভ, নিয়মানুগ ও নিরপেক্ষ মানুষ সাধারণত খুব বিরল তখন বিদ্যুৎ আসেনি। কিন্তু কল্যাণী টকিজের ডায়নামোর আলোয় মঞ্চ বিদ্যুতালোকের উজ্জ্বল ছিল। অমিয় সেনের নিপুণ ও সুদক্ষ পরিচালনায় এবং সার্থক নাট্য-প্রযোজনায় জেলার প্রোথিত যশা ও যশস্বীনাট্যকার মন্মথ রায়ের রচিত কারাগার, চাঁদসদাগর, খনা, দেবাসুর, মমতাময়ী হাসপাতাল, জীবনটাই নাটক প্রভৃতি নাটক যথেষ্ট সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চস্থ হয় এবং এই নাট্য-প্রযোজনার মধ্য দিয়ে বালুরঘাট নাট্যমন্দির বেশ সুনাম ও খ্যাতি অর্জন করে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে অমিয় সেন নতুন আঙ্গিকে সর্বপ্রথম 'কালিন্দী' ও 'দুই পুরুষ' এই দুটি নাটক পরিচালনা করে নাট্যমন্দির তথা বালুরঘাটের নাট্যজগতে আধুনকিতার প্রবর্তন করেন এবং নাট্যায়নের ক্ষেত্রী এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করে— এই জেলায় নাট্যচর্চাকে সমৃদ্ধ করে তুলেছিলেন।

তুলসী চন্দ:

দেশবিভাগের পর দিনাজপুর ড্রামাটিক ক্লাবের যশস্বী অভিনেতা তুলসী চন্দ এসে সদর শহর বালুরঘাটে নাট্যমন্দিরে অংশগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন অসামান্য Serio comic actor। তাঁর সংযমবোধ ছিল তুলনাহীন।

সহদেব চৌধুরী:

সহদেব চৌধুরী খুব স্বাভাবিকভাবে একই সঙ্গে স্ত্রী ও পুরুষচরিত্রে এবং সেই সঙ্গে Serio comic এবং Serious চরিত্রে অভিনয় যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। উদাহরণ হিসেবে 'মানময়ী গার্লস স্কুল' নাটকে মানময়ীর ভূমিকায় তাঁর অসামান্য অভিনয় আজও স্মরণীয় হয়ে আছে।

দেবল রায় (উৎপলেন্দু রায়):

দেবল রায় (উৎপলেন্দু রায়) বর্তমান বাংলাদেশের পাবনা জেলার সেতু পাড়ার রায়

পরিবারের দেবল রায়ের জন্ম হয় ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে ৩০ শে জানুয়ারিতে। এরপর বাল্যকালেই বাংলাদেশে পাঠ চুকিয়ে বিষয় সম্পত্তি ছেড়ে পিতামাতা সহ চলে আসেন বালুরঘাটে। দীর্ঘদিন বালুরঘাটের ত্রিধারা পাড়ার বাসন্তী সেবা কেন্দ্রের পেছনের একটি বাড়িতে বসবাস করতেন। পরবর্তীতে ত্রিধারা পাড়ার বাড়ি ছেড়ে চলে আসেন অভিযাত্রী পাড়ায় ১৯৫১ থেকে ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে। ছোটবেলা থেকেই তাঁর মন খেলাধূলা, নাটক করা, ছিল তাঁর নিয়মিত ব্যাপার। তিনি নাটক করতে ভালোবাসতেন। আর দর্শনীয় চেহারার জন্য কোন না কোন চরিত্র তিনি অবশ্যই পেতেন। মোটকথা জীবনের শুরুতে অর্থাৎ ৯/১০ বছর বয়সে শিশু শিল্পীর ভূমিকায় নাট্যজগতে প্রবেশ করেছিলেন।

বালুরঘাটের অনেক ক্লাব বা পাড়ায় পাড়ায় গ্রীষ্মের ছুটি অথবা পূজোর ছুটিতে নাটক হওয়ার রীতি ছিল। প্রাচ্য ভারতী, দিশারী, ডাক্‌বাংলো পাড়া, প্রায় সব জায়গাতেই নাটক অস্থায়ী মঞ্চ বেঁধে হত। দেবল রায় অভিনয় করার ডাক পেলেই যোগ দিতেন নাটক করতে, শুধু তাই নয় তিনি যে কোন চরিত্রে নাটক করতে রাজি ছিলেন। এমনকি যে চরিত্রগুলি অভিনয় করে দেখানো কঠিন, ঠিক সেই চরিত্রগুলিই থাকতো তাঁর জন্য। তিনি বলতেন চরিত্র বেছে নিয়ে অভিনয় করবো কেন? সব রকম চরিত্রেরই অভিনয় করলে তবেই তো হব অভিনেতা। আর নাটকের পরিচালকের ক্ষেত্রে পরিচালকের বয়স কত, কি তাঁর দক্ষতা কিছুই তিনি চিন্তার মধ্যে রাখতেন না। নাটক পাগল দেবল রায় যত সুনাম কুড়িয়েছেন বালুরঘাট নাট্যমন্দির থেকে। তিনি নাটকের মঞ্চ থেকে পুরস্কৃত হননি, কিন্তু একথা সত্যি পুরস্কার পাবার জন্য তিনি কোন দিনও অভিনয় করেননি। তবে তাঁর অভিনয় করা চরিত্রগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল— দুই মহলের 'ছোনেরাম', ঝুমুর নাটকে 'বাজিকর', ছেঁড়াতারের 'কানা ফকির', নীলদর্পণের 'রোক সাহেব', অমৃত্যস্যপুত্রার নাটকে একটি চরিত্র। বাঞ্ছারামের বাগানের 'জমিদার' এরকম আরও চরিত্রের উল্লেখ করা যায়। যেখানে এইসব চরিত্র করার মতো যোগ্য অভিনেতা কম ছিল। সমগ্র জেলায় তার নাম দক্ষ অভিনেতা হিসাবে নাট্যদর্শকবৃন্দের কাছে তিনি ভূয়সী প্রশংসা ও খ্যাতি লাভ করে আজও অমলিন ও অবিস্মরণীয় হয়ে আছেন।

মোট কথা দেবল রায় তাঁর ৫০ বছরের নাট্যজীবনের অসংখ্য ছোটবড় চরিত্রে প্রশংসনীয়ভাবে অভিনয় করে সেকালের নাট্য জগতে সু-উচ্চ প্রশংসা লাভ করেছিলেন। তাঁর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল— দুই মহল (ছোনেরাম), উল্কা (পেপে), টিপুসুলতান (মঁসিয়ে লালি), কালিন্দী (ননীপাল), নীলদর্পণ (রোগা সাহেব)। ছেঁড়া তার, (কানাফকির), ডা: ফস্টাস (লুসিফার), অমৃতস্য পুত্রাঃ (সজ্জন), মারীচ সংবাদ (ওস্তাদ), কালাবদর (ভূষণ মণ্ডল), কর্ণার্জুন (অর্জুন), কেদার রায় (নাম ভূমিকা), করুণা কোরানা (পুঁটিরাম হালুই), শেষ থেকে শুরু (প্রভাত ঘোষাল) প্রভৃতি।

প্রদোষ মিত্র:

১৯৫৪ সালে প্রথম নাট্যাভিনয় করেন আরামবার্গে। তারপর বিভিন্ন জায়গায় ঘুরতে ঘুরতে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন বালুরঘাটে। মাত্র ষোলো বছর বয়সে প্রথম নাট্যপরিচালনা 'অন্ধকারায়' নাটকে, একটি একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতার জন্য। তারপর 'অস্তমিত গান' ভোরের স্বপ্ন, এভাবেই অভিনয়ের চেয়ে পরিচালনায় বেশী আগ্রহী হন। ১৯৭০ সালে বালুরঘাট নাট্যমন্দির-এ যোগদেন। সেখানে 'ঝুমুর', 'টিনের তলোয়ার', 'কালের জন্য', 'অন্ধকারের নিচে সূর্য', 'ওয়েটিং ফর গোডো' প্রভৃতি নাটকে অভিনয় করেন। সেই জন্যই কয়েকজন উৎসাহী যুবককে নিয়ে স্বতন্ত্র নাট্যদল গড়ে তোলেন, তূণীর, যার সঙ্গে ১৯৯৩ খ্রি: পর্যন্ত যুক্ত ছিলেন। চাকরিসূত্রে যখন সেখানে থেকেছেন— বিলাসপুরে, কলকাতায়, নাটক করেছেন। কলকাতায় থাকার সময় চেতনার অরুণ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতেন, 'রোশন'-এর রিহার্সাল দেখতেন। তিনি নিষ্ক্রিয় তূণীর সংস্থাকে পুনর্জীবিত করেছেন। মত পার্থক্যের কারণে তিনি তূণীর দল পরিত্যাগ করে নতুন নাট্যসংস্থা গড়ে তোলেন 'নাট্যকর্মী' (১৯৯৩) নামে উল্লেখযোগ্য নাট্যসংস্থা।

ভনা খাঁ:

ভনা যতটা অভিনয়ে পারদর্শী ছিলেন, তার চেয়ে বেশী দক্ষ ছিলেন মঞ্চ নির্মাণে। সেই সময় তিনি আলোক সম্পাতে এক বিরাট পরিবর্তন এনেছিলেন। ডে লাইটে ঠুলি পাঠিয়ে তখন Dark Shifiting, হ্যাজাগ-এর ব্যবস্থা চালু হয়েছিল তাঁর সময় থেকেই এই বৈপ্লবিক পরিবর্তন আধুনিক যুগে তুচ্ছ বলে মনে হলেও সেই সময় এ ঘটনা এক বিরাট আবিষ্কার ছিল। এছাড়া ছানাদার ছায়াসঙ্গী হিসেবে ভনাদার নার উঠে আসে। বালুরঘাটে বিভিন্ন নাটকে তাদের একসঙ্গে দেখা যেত।

বালুরঘাট নাট্যমন্দিরের নাট্যকর্মী:

বিনয়ভূষণ পাল (নালু পাল):

বিনয়ভূষণ পাল ছিলেন বালুরঘাটের নাট্যমন্দিরের এক অন্যতম ও উল্লেখযোগ্য নাট্যকর্মী। তিনি এই নাট্যসংস্থার মূলত: দৃশ্যাংকন ও মেকআপের কাজে যথেষ্ট অবদান রেখেছেন। যা উল্লেখের দাবি রাখে। সামনে থেকে নাট্যমন্দিরের অভিমুখে দাঁড়ালে ডানদিকের দেওয়ালে একটি প্রশস্ত জায়গায় রং তুলি দিয়ে সিনেমার বিজ্ঞাপন আঁকা থাকত। এই শিল্পকর্মটি করতেন বিনয়ভূষণ পাল (নালুপাল)। এমনকি তিনি সর্বজন প্রিয় তারকার প্রতিরূপও অঙ্কন করতেন। এই বিজ্ঞাপন ভূমিটিতে সর্বপ্রথম নাটকের বিজ্ঞাপন আঁকেন নালু পাল। এই নালুপাল ছিলেন এক ভারসেটাইল ট্যালেন্ট। তিনি একদিকে অভিনেতা, মঞ্চশিল্পী অন্যদিকে মেকআপ ও আর্টিস্ট। তাঁর ছিল সর্বক্ষেত্রেই সক্ষম দক্ষতা। দৃষ্টান্তস্বরূপ জানা যায় যে, সূর্য মহল নাটকের প্রচারচিত্র নালু পাল ভাড়ার উপর দাঁড়িয়ে

এঁকেছেন। তার এই প্রচার চিত্র আঁকার প্রসঙ্গে বালুরঘাট তথা জেলার বিশিষ্ট নাট্যপরিচালক ও স্বনামধন্য নাট্যকার হরিমাধব মুখোপাধ্যায় বলেছেন— ''স্কুলে যাবার পথে প্রতিদিন দেখতাম রং তুলির টানে কেমন করে একটু একটু করে ছবি ফুটে ওঠে। যেদিন শেষ হল বাড়ি ফেরার পথে বিস্মিত চোখে দেখলাম রাজপোশাক পরিহিত অমিতাভ সেনের মুখ। বলাবাহুল্য অমিতাভ মানে দুলুদা ছিলেন সেই নাটকের হিরো। অন্য মুখটি ছিল সম্ভবতঃ নালুদার নিজের। নাটকের এরকম রঙিন প্রচার আমি সেই প্রথম দেখেছিলাম মোটকথা তিনি ছিলেন বিখ্যাত রূপসজ্জাকর অভিনেতা ও মঞ্চ উল্লেখযোগ্য মঞ্চপরিকল্পনাকার এমনকি তিনি অভিনেতা—পরিচালক ছিলেন। তাঁর সময় থেকেই নাট্যমন্দিরের মঞ্চ পরিকল্পনা থেকে আলোক সম্পাত এবং সাজসজ্জা সহ রূপসজ্জার ক্ষেত্রে অভাবনীয় মৌলিক পরিবর্তন দেখা দেয় যার ফলে বালুরঘাট নাট্যমন্দিরে নাট্য-প্রযোজনা যথেষ্ট সমৃদ্ধি লাভ করে।

পুরুষোত্তম গোস্বামী:

পুরুষোত্তম গোস্বামী মালদহ থেকে এসে নাট্যমন্দিরে অধিকাংশ নাটকে আলোক সম্পাতের কাজে যুক্ত ছিলেন। বালুরঘাট নাট্যমন্দিরের প্রতি তাঁর গভীর টান ছিল যা কখনও ভোলার নয়। মূলতঃ মালদহ জেলার কালিয়াচকবাসী অবাঙালী এই ব্যক্তি নিজের অর্থ ব্যয় করে সারা জীবন ধরে আলো নিয়ে বিভিন্নভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। নাটকে সেই সময় ফ্লাড লাইটে মঞ্চাভিনয় হতো। তাই স্পট, মিরর, ডিমার ও প্রজেকশন এসব তখন সারা উত্তরবঙ্গ জুড়ে ছিল না বললেই চলে কিন্তু তিনি নিজব্যয়ে আলোক সম্পাতের ক্ষেত্রে আলোর এসব সরঞ্জাম ক্রয় করে নাটকে সফলভাবে প্রয়োগ করতেন। তাই বলতে বাঁধা নেই যে, আজ পর্যন্ত পুরুষোত্তম সোমানী বালুরঘাট নাট্যমন্দির তথা উত্তরবঙ্গের শ্রেষ্ঠ আলোক শিল্পী একথা নিশ্চিত করে বলা যায়।

কালি হোড়:

কালি হোড় বালুরঘাট নাট্যমন্দিরের একজন বিশিষ্ট মেক আপ শিল্পী বলে পরিচিত ছিলেন। তিনি এই নাট্যসংস্থার দৃশ্যাঙ্কন ও মেকআপ ম্যানের কাজে যথেষ্ট দক্ষতার সঙ্গে পরিচালনা করেছেন।

মহিলা চরিত্র:

গীতাদি, সুকুদি, রুবি:

মহিলারা নারী চরিত্রে প্রথম রূপ দান করেন কালিঙ্গী নাটক অভিনয়ের মাধ্যমে। যে মহিলারা এই বৈপ্লবীক কর্মে অবতীর্ণ হয়েছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম গীতাদি, মুকুদি ও রুবি। তাঁরা সকলে সেই সময়কার সামাজিক সংস্কারকে দূরে ঠেলে দিয়ে মঞ্চে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। নাট্যমন্দিরের এই পদক্ষেপ যেন এক নতুন যুগের আগমন ঘটিয়েছিল যা বালুরঘাট শহরে তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি

করেছিল। মহিলাদের মঞ্চাবতরণ উদ্দীপক ও সুদূর প্রসারী হয়েছিল যা নাট্যমন্দিরের সম্মান বাড়িয়েছে।

ত্রিতীর্থ:

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার 'ত্রিতীর্থ' উত্তরবঙ্গের বিখ্যাত নাট্যসংস্থাগুলির মধ্যে প্রথম সারির অন্যতম ও উল্লেখযোগ্য পরিচিত নাম। প্রত্যন্ত এক মফস্বল শহর বালুরঘাটে বিংশ শতাব্দীর সাত-এর দশকে নতুনকালের নাট্যসংস্থা রূপে প্রতিষ্ঠালাভ করে অফুরন্ত প্রাণশক্তির সঙ্গে সৃজনীশক্তির অতুলনীয় পরিচয় প্রদান করে বর্তমানেও গর্বের সঙ্গে অতীতে সুসমৃদ্ধ নাট্য ঐতিহ্যের ধারাকে ধারণ করে নাটক মঞ্চস্থ করে চলেছে। তাই ত্রিতীর্থ নাট্যসংস্থা মফস্বল বাংলায় তুলনারহিত। এই নাট্যসংস্থা শিল্পগুণ সম্পন্ন নাট্যচর্চার মধ্য দিয়ে এই নাট্যসংস্থার কর্ণধার তথা মূলকাণ্ডারী উত্তরবঙ্গের খ্যাতনামা নট-নাট্যকার ও নাট্যপরিচালক হরিমাধব মুখোপাধ্যায় উচ্চতর শিল্পজ্ঞানের সুনিপুণ প্রয়োগে ত্রিতীর্থ প্রযোজিত নাট্যভিনয়ের নির্দেশনা ও পরিচালনায় তাঁর উচ্চতর শিল্পবোধের সুনিপুণ প্রয়োগের মাধ্যমে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ ও তার বাইরে অভূতপূর্ব পরিচিতি লাভ করে। ত্রিতীর্থের নাট্যশিল্পীদের চিত্তচমৎকারী অভিনয় জেলসহ বৃহত্তর বঙ্গে বহু প্রশংসা অর্জন করে চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। এই সংস্থার দলগত অভিনয় নজিরবিহীন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। এই সংস্থার সমৃদ্ধ নাট্যচর্চার হাত ধরে খ্যাতিসম্পন্ন নট-নাট্যকার অসাধারণ অভিনেতা-অভিনেত্রী। প্রখ্যাত নাট-নির্দেশক পরিচালক ও নাট্যকর্মীর আবির্ভাব ঘটেছিল, ত্রিতীর্থ আজও স্বমহিমায় মর্যাদার সঙ্গে নাট্যচর্চায় ক্রিয়াশীল থেকে অসংখ্য সুঅভিনেতা-অভিনেত্রীদের তুলে এনেছেন। এবং তারা দক্ষতার সাথে দর্শক মনোরঞ্জন করে সু-উচ্চ প্রশংসা লাভ করেছে।

হরিমাধব মুখোপাধ্যায়:

শিশুকাল থেকেই নাট্যানুরাগী ছিলেন হরিমাধব মুখোপাধ্যায়। সপ্তম শ্রেণীতে পড়াশুনা করার সময় 'তরুণতীর্থ' নাট্যদল গঠন করেন। তরুণতীর্থ দলের প্রথম নাটক ছিল 'বন্দিবীর' হরিমাধবের প্রথম নাট্যরচনা আগাথা ক্রিস্টির কাহিনি অবলম্বনে 'দশপুতুল', ও চেকভের কাহিনি অবলম্বনে 'বহ্বরম্ভ' (১৯৫৯)। এরপর তিনি বালুরঘাটে নাট্যমন্দির থেকে বেরিয়ে আসা বেশ কিছু নাট্যশিল্পীদের নিয়ে ত্রিতীর্থ নাট্যসংস্থা গঠন করেন ১৯৫৯খ্রিস্টাব্দে ২৬ শে আগস্ট। নাট্যবিষয় কারোর কাছে শিক্ষা গ্রহণ করেননি। বরং কলকাতার সমস্ত মঞ্চে পেশাদার অপেশাদার নির্বিশেষে প্রায় সব নাটক দেখার অভিজ্ঞতা, বিশেষত বিজন ভট্টাচার্য, শম্ভু মিত্র, উৎপল দত্ত, ও অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নতুন রীতির নাটক দেখার অভিজ্ঞতা পরবর্তীকালে তাঁর নিজস্ব প্রয়োগরীতি গঠনের সহায়ক হয়েছে। পরবর্তীকালে হাওড়ায় জগমোহন মজুমদারের তত্ত্বাবধানে নাটক ও অভিনয় দিয়ে

কিছু কাজ করেন এবং ওই সময়কালেই তরুণ মুখোপাধ্যায়ের সান্নিধ্য লাভ করেন। বিভিন্ন নাট্যসংস্থায় হরিমাধব বাবুর নির্দেশনায় এবং অভিনীত নাটকগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল— (তরুণতীর্থ), বন্দিবীর, আক্কেল সেলামি, ছেঁড়া কাগজের ঝুড়ি, পাপ ও পাপী, করুণা করোনো, নাট্যকারের সন্ধানে দুটি চরিত্র, রজনীগন্ধা প্রভৃতি। বালুরঘাট নাট্যমন্দির— অমৃত অতীত, অমৃতস্য পুত্রাঃ, ছায়া নায়িকা, চারপ্রহর, লৌহপ্রাচীর। ত্রিতীর্থ— 'পুতুল খেলা', 'বৃষ্টি বৃষ্টি', 'শের আফগান', 'ভাঙাপট', 'ছুটির খেলা', 'তিন বিজ্ঞানী', 'গ্যালিলেও', 'অনিকেত', 'সম্ম্যস্ত', 'মন্ত্রশক্তি', 'খারিজ', 'জল' (মহাশ্বেতা দেবীর সহযোগে), 'দেবাংশী' , 'বোধদয়' প্রভৃতি। তাঁর রচিত নাটকগুলির মধ্যে (পূর্ণাঙ্গ) 'দশ পুতুল', 'বহ্বরম্ভ', 'শিশুপাল' (নির্মলেন্দু তালুকদারের সহযোগে), 'অনিকেত', 'বিছন' (হিন্দ), মন্ত্রশক্তি, সম্ম্যস্ত, অন্তর্ধান, খারিজ, জল (মহাশ্বেতা দেবীর সহযোগে), 'মাতৃতান্ত্রিক'; (একাঙ্ক) 'খেলনাই স্কুল', 'বোধদয়, উপলব্ধি, নিকট গঙ্গা, বন্দুক, পনশুদ্ধি, ক্ষীরের পুতুল (অবনীন্দ্রনাথ, বিপুলৌষধি ..... পরশুরাম, গোধূলী বেলায় প্রভৃতি। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ তাঁর 'দেবাংশী' নাটককে শ্রেষ্ঠ প্রযোজনার ও 'বিছন'-এ তাঁকে বিশিষ্ট অভিনেতার স্বীকৃতি লাভ করেন। তিনি জেলা ও জেলার বাইরে বহু প্রতিষ্ঠান থেকে পুরস্কৃত হয়েছেন। হরিমাধব মুখোপাধ্যায় অভিনেতা এবং 'দেবীগর্জন' নাটক প্রযোজনার শ্রেষ্ঠত্বে স্মারক হিসাবে দিশারি পুরস্কারে পুরস্কৃত হয়েছেন। ১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দে বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব হিসাবে নান্দীকার জাতীয় নাট্যামেলায় তিনি সম্মানিত হয়েছেন। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় অজস্র প্রবন্ধ নাট্যচর্চা নাট্যসমালোচনা বিষয়কে নিয়ে জ্ঞান ও রসসমৃদ্ধ লেখার মধ্য দিয়ে সুনাম ও খ্যাতি অর্জন করেছেন।

নির্মলেন্দু তালুকদার :

শৈশবকাল থেকেই থিয়েটারের প্রতি তাঁর খুব আকর্ষণ ছিল। তাঁর প্রথম মঞ্চাবতরণ 'সিঁথির সিঁদুর' নাটকে। অভিনয়ের মধ্য দিয়ে ছাত্রজীবনের বন্ধুসম হরিমাধব মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে তরুণতীর্থ (১৯৬০) নাট্যসংস্থায় যোগদান করেন। সেখানে তিনি অভিনয় করেছেন, মঞ্চের কাজ করেছেন, সংগঠনের দায়িত্ব নিয়েছেন এবং নিজে নাটক লিখে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছেন। ত্রিতীর্থ প্রযোজিত 'এবং ইন্দ্রজিৎ', 'বৃষ্টিবৃষ্টি', 'দেবাংশী', 'বন্দিসম্রাট', 'তুঘলক' ইত্যাদি নাটকে প্রশংসনীয় অভিনয় করে খ্যাতি লাভ করেন। তরুণ তীর্থর জন্য নাটক লিখেছেন 'ছেঁড়া কাগজের ঝুড়ি', 'শেষ কোথায়', 'ত্রিতীর্থ'-র জন্য লিখেছেন (হরিমাধব মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে যৌথভাবে) 'শিশুপাল', 'ওম' ও রবীন্দ্রনাথের 'ঠাকুরদা' গল্পের নাট্যরূপ' ইত্যাদি নাটক লিখে জেলার নাট্যচর্চায় বেশ সাড়া জাগিয়ে আলোড়ন সৃষ্টি করেছেন।

প্রভাস সমাজদার:

প্রভাস সমাজদার বালুরঘাট নাট্যমন্দির-এ প্রবেশের মাধ্যমে নাট্যজীবনের সূচনা করলেও পরবর্তীকালে তিনি ত্রিতীর্থ নাট্যদলে কাজ করেন। তাঁর প্রথম নাটক 'খনা'। এরপর অভিনয় করেন— 'ক্ষুধা' দমকল, রূপোলি চাঁদ, ফেরারী ফৌজ প্রভৃতি নাটকে। তিনি একটি নাটক পরিচালনাও করেছেন— 'ছায়ানট। এই শিল্পীর বাড়িতে বসেই ত্রিতীর্থ নাট্যসংস্থা গঠিত হয় (১৯৫৯)। ত্রিতীর্থতে সাফল্যের সঙ্গে অভিনয় করেছেন— পুতুলখেলা, বিজ্ঞাপন, পরবাস, দেবীগর্জন ইত্যাদি নাটকে তিনি অভিনয় ছাড়াও মঞ্চের কাজও করতেন।

সত্যরঞ্জন তালুকদার:

সত্যরঞ্জন তালুকদার ছাত্রজীবনে নিয়মিত যাত্রায় অভিনয় করতেন। পঞ্চম শ্রেণীতে পাঠরত অবস্থায় 'রাজা হরিশ্চন্দ্র' নাটকে প্রথম অভিনয় দিয়ে তাঁর অভিনয় জগতে পদার্পণ শুরু হয়। শান্তিরঞ্জন গুহের উৎসাহে বালুরঘাট নাট্যমন্দির-এ সেখানে স্ত্রী চরিত্রে অভিনয় করতেন। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য লক্ষ্মীবাঈ, কেদাররায়ের পত্নী ইত্যাদি। বন্ধু কানাই দত্ত অবিনাশ দত্তের সঙ্গে ভিন্নধর্মী নাটক ভিন্ন আঙ্গিকে উপস্থাপনার উদ্দেশ্যে ত্রিশূল নাট্যসংস্থা গড়ে তোলেন। এই নাট্যসংস্থার প্রযোজনায় ও তাঁর নির্দেশনা 'মুক্তধারা' এবং 'ইন্দ্রজিৎ' ও 'রাক্ষস' নাটক মঞ্চস্থ হলে বহুল প্রশংশিত হয়। তিনি পরবর্তীকালে ত্রিতীর্থ-র অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিলেন। সেখানে তার অভিনীত উল্লেখযোগ্য নাটক 'অমৃতস্য পুত্রাঃ', 'শের আফগনি', 'দেবীগর্জন', 'গ্যালিলিও', 'শিশুপাল' ইত্যাদি। তাঁর রচিত নাটকগুলি মরুপথে, পরিবর্তন, 'প্রেম পরীক্ষা' ইত্যাদি যা জেলার নাট্যচর্চায় অভাবনীয় অবদানের স্বাক্ষর বহন করে।

অবিনাশ দত্ত:

ত্রিতীর্থ নাট্যসংস্থার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হলেন অবিনাশ দত্ত। প্রথম জীবনে বালুরঘাট নাট্যমন্দিরে যোগ দেন ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে। তিনি প্রথম দিকে স্ত্রী চরিত্রে অভিনয় করতেন। 'কেদার রায়', 'দমকল',প্রভৃতি নাটকে তাঁর অভিনয় প্রশংসিত হয়। ১৯৬০ সালে কিছু নাট্যকর্মী নিয়ে তিনি গঠন করেন— 'ত্রিশূল'। ত্রিতীর্থ আয়োজিত 'ভাঙাপট' তিন বিজ্ঞানী, বল্লভপুরের রূপকথা, গ্যালিলিও, ইত্যাদি নাটকে তাঁর অভিনয় করে তিনি বেশ সুনাম অর্জন করেছিলেন।

কানাই দত্ত:

কানাই দত্ত নাট্যজগতে প্রবেশ করেন ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দের দিকে নাট্যমন্দিরে অভিনয়ের মধ্য দিয়ে। ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দে বন্ধু অবিনাশ দত্তের সহযোগে ত্রিশূল নাট্যসংস্থা গঠন করেন। নাট্যমন্দির— 'মমতাময়ী হাসপাতাল', 'ত্রিশূল'— প্রায় সব নাটকই, 'ত্রিতীর্থ'— তুঘলক, বন্দিসম্রাট, গ্যালিলিও,

বল্লভপুরের রূপকথা, ক্ষুরস্যধারা প্রভৃতি নাটকে তিনি দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। তিনি ত্রিতীর্থ নাট্যসংস্থায় বহু বছর ধরে সম্পাদক ছিলেন।

অমিতাভ সেন (দুলু):

বালুরঘাটের আর একজন অন্যতম নাট্যকার হলেন অমিতাভ সেন, দুলু, তিনি ১৯৩৩ সালে মার্চ মাসের ১১ তারিখে জন্মগ্রহণ রকরেন। বাল্যবয়স থেকে আবৃতি করতে করতে ক্রমে যথেষ্ট পারদর্শিতা লাভ করেন। জিতেন সেনের পরামর্শে বালুরঘাট নাট্যমন্দিরে যোগ দেন এবং ধারাবাহিকভাবে ১৮ বছর ওই সংস্থার সদস্য হিসেবে নাট্যাভিনয়ে দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। অমিতাভ সেন ছিলেন ত্রিতীর্থের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। 'অমৃতস্য পুত্রাঃ', 'তিন বিজ্ঞানী', 'শের আফগান', 'মঙ্গলাচরণের বিবাহ' প্রভৃতি নাটকে তিনি দর্শকের মন জয় করেন।

বিশুদা (ধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ):

ড. ধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ অভিনেতারূপে উঁচু দরের ছিলেন না। কিন্তু যত ছোট রোলই তাঁকে দেওয়া যাক না কেন তা তিনি নিষ্ঠার সাথে পালন করনে। তিনি ত্রিতীর্থের জন্মলগ্ন (১৯৬৯)-এর প্রথম দিন থেকেই এর সদস্য ছিলেন না। ১৯৭০ সাল নাগাদ নাট্যমন্দির থেকে ত্রিতীর্থে যোগ দেন। তিনি আজীবন ত্রিতীর্থের সদস্য ছিলেন।

'ছুটির খেলা' নাটকটি ছিল বিশুদা অভিনীত (ত্রিতীর্থ) প্রথম নাটকে খুব ভাল অভিনয় করেছিলেন তিনি। আসলে বিশুদা সেই প্রথম তাঁর নাট্যজীবনে কোন শৃঙ্খলার মধ্যে এলেন— যেখানে যোগ্য পরিচালকের কাছে নাটকের নানা কলাকৌশল রপ্ত করার শিক্ষা পেলেন। ফলে 'ছুটির খেলা' বিশুদার জীবনের (ত্রিতীর্থের নাট্যজীবনে) প্রথম নাটক হলেও তাঁর বাকি নাট্যজীবনে দারুণ অনুপ্রেরণার কাজ করেছিল। তিনি দেবীগর্জন, বিজ্ঞাপন, বল্লভপুরের রূপকথা প্রভৃতি নাটকে বিভিন্ন চরিত্রে যথেষ্ট যত্নের সঙ্গে অভিনয় করেছেন। 'ভাঙাপট'-এ তাঁর সার্কেল ইন্‌পেক্টর -এর ভূমিকায় অভিনয় ভুলবার নয়। বসে বসে পাট বটে, কিন্তু ঐ লম্বা দর্শনাই চেহারা, সুপুরুষ বিশুদার মঞ্চে আবির্ভাব একটা আলাদা নাট্য পরিবেশের সৃষ্টি করত। দেবীগর্জন নাটকে তাঁর অভিনয় স্মরণীয়। 'বিজ্ঞাপন' এ স্বর্গীয় কানাই দত্ত মহাশয়ের সঙ্গে তিনি সহশিল্পীরূপে অভিনয় করে প্রশংসাধন্য হয়েছিলেন। দেবীগর্জন নাটকে ঐ বয়সে কোমড় ভেঙে নেচে কুঁদে তিনি আসর মাত করেছিলেন। 'বল্লভপুরের রূপকথা' তার অভিনয় জীবনের একটি মাইলস্টোন। এছাড়াও শিশুপাল, তিন বিজ্ঞানী নাটকে অভিনয় করে যথেষ্ট প্রশংসিত হন।

মানস সেন:

ত্রিতীর্থ সংস্থার অন্যতম প্রতিষ্ঠা সদস্য ছিলেন মানস সেন। অভিনয়ের তুলনায় থিয়েটারের অন্যান্য কাজ আগ্রহ দেখিয়েছিলেন। খুব উল্লেখযোগ্য না হলেও দুই একবার অভিনয় করেছেন ছোটখাটো চরিত্রে বালুরঘাট নাট্যমন্দির-এ। ত্রিতীর্থেও মঞ্চের নেপথ্যের কাজ করেছেন। একাজে তাঁর দক্ষতা ছিল খুব প্রশসনীয়। এছাড়াও তিনি বন্দিসম্রাট, তিন বিজ্ঞানী, নাটক দুটিতে যোগ্যতার সঙ্গে আবহসংগীত প্রেক্ষপণের কাজ করেছেন।

শুভ্রাংশু শেখর মৈত্র :

১৯৬৫ সালে প্রাণোচ্ছল, রসিক এক মানুষ বালুরঘাটে আসেন। ১৯৬৯ সালে ত্রিতীর্থপ্রতিষ্ঠা হবার পর নাটকের শুভ্রাংশু শেখর মৈত্র শুধু অভিনেতা ও নাট্যকারও ছিলেন। তিনি চমৎকার ছবিও আঁকতেন। অসম্ভব ক্ষিপ্রতা ছিল তাঁর ছবি আঁকার ব্যাপারে। ত্রিতীর্থের মঞ্চ পরিকল্পনা করেছেন। বিশেষত সময়োপযোগী পোষাকের পরিকল্পনা করেছেন। ত্রিতীর্থের তুঘলক, গ্যালিলেও, চিরকুমার সভা, প্রভৃতি নাটকের অভিনয় করে প্রশংসিত হয়েছেন গ্যালিলেও, তিন বিজ্ঞানী, তুঘলক চিরকুমার সভা, অর্থম অনর্থম প্রভৃতি নাটকে অসাধারণ দক্ষতার সঙ্গে অভিনয় করে দর্শক সমাদর লাভ করেন। তাঁর নিজের রচিত নাটকের মধ্যে রয়েছে বন্দী সম্রাট, কেমনে তারে মিচে কলা যায় এবং পদ্মাবতী কথা। মৌলিক ব্যাখ্যায় ও বৈচিত্র্যপূর্ণ বিষয় ভাবনায় তাঁর রচিত এই নাটকগুলি উল্লেখযোগ্য।

তিনু ব্যানার্জী:

তিনি ত্রিতীর্থের অসাধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন অভিনেতা ছিলেন। বালুরঘাট ত্রিতীর্থে অভিনেতা হিসেবে অংশ গ্রহণ করেন। ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দে এবং প্রায় ১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত যুক্ত ছিলেন। প্রথম অভিনয় বিমল করের নাটক 'কর্ণকুন্তী সংলাপ' এ ছেলের চরিত্রে অংশগ্রহণ করেন ও এটিই ছিল ত্রিতীর্থে তাঁর প্রথম অভিনয়। এরপর বিজন ভট্টাচার্যের 'দেবীগর্জন' এ সঞ্চারিয়া, মঙ্গলিয়া, খগেশ্বর চরিত্রে অভিনয় করেন। 'ক্ষুরস্যধারা'-এলবার্ট কামুর রচিত নাটকও অভিনয় করেন। মহাশ্বেতা দেবীর গল্পের 'জল' এর কাহিনী অবলম্বনে নাট্যরূপ দেন হরিমাধব মুখোপাধ্যায়। এখানেও অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করেন। মনোজ মিত্রের নাটক 'পরবাস' প্রভৃতি নাটকেও অভিনয় করে সাড়া ফেলে দিয়েছিলেন। নাট্যকার ব্রেথটোর 'গ্যালিলিও গ্যালিলেই' (অনুবাদ-নীহারঞ্জন ভট্টাচার্য, আংশিক পার্ট অনুবাদ-সুভাষ চ্যাটার্জী), ডুরাণ্ড ম্যাড এর Three Physicist (তিন বিজ্ঞানী নামে অনুবাদ করেন নীহারঞ্জন ভট্টাচার্য) নাটকে অভিনয় করেন। ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দে দেবাংশী নাটকের মূখ্য চরিত্র দেবাংশীর ভূমিকায় অভিনয়ের জন্য তিনু বন্দ্যোপাধ্যায় দিশারী পুরস্কার লাভ করেন।

কমল দাস:

ত্রিতীর্থ নাট্যদলে অংশ গ্রহণ করেন ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দে। তাঁর প্রথম অভিনয় বিজন ভট্টাচার্যের দেবীগর্জন নাটকে। এরপর তিনি মনোজ মিত্রের পরবাস (নিমাই চরিত্রে), জল (পরম চরিত্রে), দেবাংশী (নাট্যরূপ হরিমাধব মুখোপাধ্যায়, গ্রাম্যবৃদ্ধ চরিত্রে), বিচন (হরি চরিত্র) প্রভৃতি নাটকে অভিনয় করে তিনি বালুরঘাটের নাট্যজগতের নাট্যপ্রেমীদের মুগ্ধ করেছিলেন। এছাড়াও তিনি অন্তর্ধান, অসমাপিকা, মঞ্জুরী আমের মঞ্জুরী, ভোজন দক্ষিণা, মন্ত্রশক্তি, জল, অর্থম অনর্থম প্রভৃতি নাটকেও অভিনয় করেছেন যথেষ্ট দক্ষতার সাথে। 'বিছন' নাটকে অভিনয়ের জন্য উত্তরবঙ্গ নাট্যজগৎ পত্রিকাগোষ্ঠী কর্তৃক তিনি শ্রেষ্ঠ অভিনেতা হিসেবে পুরস্কার লাভ করেন।

অর্ধেন্দু সরকার:

ত্রিতীর্থ নাট্যসংস্থার আর একজন অন্যতম সদস্য হলেন অর্ধেন্দু সরকার। ষাটের দশকের প্রথমভাগে নাট্যমন্দিরের সংস্পর্শে নাটকে আগ্রহ তৈরি হয়। ত্রিতীর্থ প্রতিষ্ঠার সময় থেকেই সংস্থার সঙ্গে যুক্ত হন। তিনি ১৯৯৬-এ ত্রিতীর্থ-র সভাপতিও হয়েছিলেন। 'ভাঙ্গাপট', 'দেবীগর্জন', 'জল', 'মন্ত্রশক্তি', 'দেবাংশী' ইত্যাদি বহু নাটকে বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন।

অলোক চৌধুরী (মিলন):

১৯৭৬ সালে রূপান্তর গোষ্ঠীর 'রামের পালা' নামক নাটকে অভিনয়ের মাধ্যমে নাট্যজগতে প্রবেশ। ত্রিতীর্থের 'দেবাংশী' নাটকের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করে 'বিছন', 'জল', 'মন্ত্রশক্তি', 'চিরকুমার সভা', 'ঠাকুরদা' নাটকে সকলের মন জয় করেন। অভিনয় ছাড়াও থিয়েটারের যাবতীয় কাজের প্রতি তাঁর সমান ছাড়াও থিয়েটারের যাবতীয় কাজের প্রতি তাঁর সমান আগ্রহ ছিল। পোষাক পরিচ্ছদ, মঞ্চনির্মাণ ইত্যাদি ব্যাপারে ঘনিষ্টভাবে যুক্ত থাকেন।

গৌতম সেন :

গৌতম সেনের নাট্যজীবনের সূচনা হয় ত্রিতীর্থ নাট্যসংস্থায়। তিনি ১৯৯৬ সালে ত্রিতীর্থ নাট্যসংস্থার সম্পাদকও ছিলেন। তাঁর প্রথম নাটক ছিল—শের আফগান। গৌতম সেন ছিলেন একজন নির্ভরযোগ্য অভিনেতা। দেবীগর্জন, শিশুপাল, মঙ্গলাচরণের বিবাহ, বন্দি-সম্রাট, পরবাস, গ্যালিলিও, জল, তুঘলক, দেবাংশী, বল্লভপুরের রূপকথা প্রভৃতি নাটকে উল্লেখযোগ্য অভিনয় করেন।

বিকাশ কর্মকার:

বিকাশ কর্মকার ১৯৫৪ সালে বালুরঘাটেই জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম ব্রজেন্দ্রনাথ কর্মকার। ১৯৭০ সালে ত্রিতীর্থ নাট্যসংস্থায় অভিনয় করেন। তারপর বিভিন্ন প্রযোজনায় ছোটখাটো ভূমিকায় অভিনয় করলেও মঞ্চের আলোকসম্পাতের কাজে পারদর্শিতা অর্জন করেন। বহুদিন

ত্রিতীর্থে আলোর কাজ করেছেন অত্যন্ত নিপুনতার সঙ্গে। প্রয়োজন হলে অভিনয়ও করেছেন।

ভূদেব দত্ত:

ত্রিতীর্থ-র জন্মলগ্ন ওই সংস্থার সঙ্গে যুক্ত। স্কুল ও কলেজ জীবন থেকেই তিনি অভিনয় করতেন। তাঁর অভিনীত নাটক 'অমৃতস্য পুত্রাঃ, শের আফগান, বিজ্ঞাপন, চোখের আলো, দেবীগর্জন, শিশুপাল, বৃষ্টি বৃষ্টি, বন্দি সম্রাট, ভাঙাপট, মঞ্জরী আমের মঞ্জরী, মন্ত্রশক্তি, জল, অর্থম অনর্থম ইত্যাদি।

প্রশান্ত সরকার:

প্রশান্ত সরকার ছিলেন ত্রিতীর্থ নাট্যসংস্থার আলোক শিল্পী। থিয়েটারের রপ্রতি ভালোবাসা তাঁকে অভিনয়ের দিকে আকর্ষণ না করে নেপথ্য কর্মকাণ্ডের প্রতি আগ্রহী করে তোলে। ত্রিতীর্থ প্রযোজনাগুলিরর মধ্যে ''গ্যালিলেও', 'বিছন' দেবাংশী' মন্ত্রশক্তি', বোধদয়, জল, মঞ্জরী আমের মঞ্জরী প্রভৃতি প্রভৃতি তাঁর আলোকপাত প্রশংসিত।

নিমাই দে:

বালুরঘাটের অন্যতম সেরা আলোকশিল্পী ছিলেন নিমাই দে। যে কোন সংস্থার ডাকে তিনি যে কোন জায়গায় চলে যেতেন আলোকসজ্জার জন্য। লোকায়ণ প্রযোজিত 'চেতনা' নাটকে প্রথম আলোক সম্পাত করেন ১৯৭১ সালে প্রথম জীবনে ত্রিতীর্থ-এর প্রযোজনাও আলোকসম্পাতের দায়িত্ব পালন করেছেন। এরপর নাট্যতীর্থ, তূণীর, নাট্যকর্মী, দর্পণ, সংকেত, আত্রেয়ী, অনামিকা, ছন্দম ইত্যাদি নাট্যসংস্থার নাটকে আলোকসম্পাত করেছেন।

রানা রায়:

১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে প্রদোষ মিত্রের নির্দেশনায় প্রবেশ করেন। 'ঈশ্বরবাবু আসছেন' নামক নাটকে প্রথম অভিনয়। এরপর তিনি তূণীর নাট্যসংস্থায় প্রবেশ করেন। ১৯৭৫ সালে তিনি সেখানে 'অগ্নিগর্ভ হেকেমপুর ও পরাণমণ্ডলের ঘর গেরস্থি' একটি মাত্র নাটকে অভিনয় করেন। ওই বছরেই ত্রিতীর্থ নাট্যদলে যোগ দেন। 'দেবীগর্জন' নামক একটি নাটকে অভিনয় করে নাট্যরসিকদের চমকে দেন। তারপর একে একে 'বিজ্ঞাপন', 'বল্লভপুরের রূপকথা', 'দেবাংশী', 'বিছন' ইত্যাদি নাটকে অভিনয় করে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর শেষ নাটক 'মঞ্জরী আমের মঞ্জরী'।

স্বপন রায়:

মাত্র চোদ্দো বছর বয়সে তরুণতীর্থ নামে একটি নাট্যদলের সদস্য হন। সেই সুবাদে ত্রিতীর্থরও প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। প্রথম থেকেই তিনি নানা ধরনের অভিনয় করেছেন। তাঁর অভিনীত নাটক 'বৃষ্টি বৃষ্টি', 'নাট্যকারের সন্ধানে ছটি চরিত্র', 'করুণা করোনা', 'শিশুপাল', 'জল', 'দেবাংশী', 'তুঘলক', 'অর্থম অনর্থম' ও 'মন্ত্রশক্তি' প্রভৃতি নাটকে অভিনয় করে বেশ খ্যাতি অর্জন করেন।

মহিলা চরিত্র:

মমতা চট্টোপাধ্যায়:

বালুরঘাট ত্রিতীর্থ প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকে এই সংস্থায় অভিনয়ের মধ্য দিয়ে অভিনেত্রী হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। ১৯৭২ সালে 'তিন বিজ্ঞানী' নাটকে ড. ঝা-এর চরিত্রে অভিনয় করে সারা ফেলে দেন। ওই নাটকের আলোচনা প্রসঙ্গে তখন পশ্চিমবঙ্গের অনেক পত্র-পত্রিকায় তার অভিনয় প্রশংসিত হয় এবং পরবর্তীতে আরও বেশ কিছু নাটকেও অভিনয় করে প্রশংসা অর্জন রকরেন।

চয়নিকা গুহরায়:

চয়নিকা গুহরায় সম্ভবত পিতার হাত ধরেই ত্রিতীর্থ নাট্যদলে যোগ দেন। ১৯৭০ সালে 'অমৃতস্য পুত্রাঃ' নাটকে তাঁর প্রথম অভিনয়। তিনি মোটামুটি ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত ত্রিতীর্থ নাট্যদলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাঁর ডাক নাম ছিল বাচ্ছি, ওই নামেই দলের ছোটবড় সকলের প্রিয়। নাট্যাভিনয়ের ক্ষেত্রে স্বামীর কাছ থেকে যথেষ্ট উৎসাহ পেয়েছেন। তাঁর অভিনীত নাটক— ''ভাঙাপট', তিন-বিজ্ঞানী, মঞ্জুরী আমের মঞ্জুরী, ছুটির খেলা, বিজ্ঞাপন প্রভৃতি নাটকে অভিনয় করে বেশ প্রশংসা অর্জন করেছিলেন।

মানসী ভৌমিক:

সপ্তম শ্রেণীতে পড়তে পড়তেই নাট্যজগতে প্রবেশ করেন। তাঁর প্রথম নাটক 'ডাকঘর'। পিতা যতীন্দ্রনাথ ভৌমিক নাট্যানুরাগী ছিলেন, জন পাড়ার নাটকে অভিনয় করতে মেয়েকে উৎসাহ দিয়েছেন। পিতার আগ্রহে 'ভাঙাপট' নাটকে একটি ছোট চরিত্রে অভিনয়সূত্রে ত্রিতীর্থ নাট্যসংস্থায় পদার্পণ। এরপর তিনি 'দেবীগর্জন', 'গ্যালিলেও', 'জল', 'বিছন', 'মন্ত্রশক্তি' প্রভৃতি নাটকে অভিনয় করে একজন দক্ষ অভিনেত্রী হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

ঋতা দত্তচক্রবর্তী:

স্মতা চক্রবর্তী ১৯৬৫ সালের ফেব্রুয়ারিতে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম কালীপদ চক্রবর্তী। চলচিত্র, বেতার ও দুরদর্শনে অভিনয় করেও কলকাতার সংঘ থিয়েটারের সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত। তাঁর অভিনীত উল্লেখযোগ্য মঞ্চনাটক ও চরিত্র— 'হাজার চুরাশির মা' (নন্দিনী), 'রক্তকরবী' (চন্দ্রা), 'অদ্ভূত আঁধার' (সকুন্যা), আলকানন্দার পুত্র কন্যা' (দেবাহুতি), লজ্জাতীর্থ (মেরি), অভিমুখ (সারা), ১৯৮৮ সালে নবীন থিয়েটার কর্মী হিসাবে ঋতা চক্রবর্তী কেন্দ্রীয় সরকারের মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক প্রদত্ত জাতীয় বৃত্তি পেয়েছেন।

পম্পা সমাজদার:

বালুরঘাটের একজন খ্যতনামা মহিলা নাট্যকর্মী হলেন পম্পা সমাজদার। ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি

বালুরঘাট নাট্যমন্দিরে প্রবেশ করেন। নাট্যমন্দিরে তিনি 'ফেরারী ফৌজ', 'দুই মহল', 'চার প্রহর' প্রভৃতি নাটকে অভিনয় করে সাড়া ফেলে দিয়েছিলেন। বালুরঘাট জুড়ে। এরপর তিনি নাট্যমন্দির ছেড়ে ত্রিতীর্থে যোগ দেন। ত্রিতীর্থে তাঁর প্রথম নাটক ছিল— 'পুতুল খেলা'। এছাড়াও তিনি 'দেবীগর্জন', 'মঞ্জরী আমের মঞ্জরী', 'নাট্যকারের সন্ধানে দুটি চরিত্র', 'কর্ণকুন্তী সংলাপ', 'তিন বিজ্ঞানী', 'শের আফগান' ইত্যাদি নাটকে অভিনয় করে সম্মান লাভ করেন।

সান্ত্বনা গুহ:

অমৃতস্য পুত্রাঃ নামক নাটকে তিনি প্রথম অভিনয় করেন। পরবর্তীকালে পিতার অনুপ্রেরণায় ত্রিতীর্থ নাট্যদলে যোগ দেন। সেই থেকে ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এই সংস্থার বিভিন্ন প্রযোজনায় উল্লেখযোগ্য কাজ করেছিলেন। তিন বিজ্ঞানী', 'দেবীগর্জন', 'ভাঙাপট', 'পরবাস', ও 'বন্দিসম্রাট'-এ মুখ্য স্ত্রী ভূমিকায় তাঁর অভিনয় যথেষ্ট প্রশংসা লাভ করে এবং দক্ষ নাট্যশিল্পী রূপে খ্যাতি অর্জন করেন।

তনুশ্রী সরকার:

তনুশ্রী সরকার ছিলেন সামরিক দপ্তরের একজন ক্যাডার। তিনি তিনটি নাটকে অভিনয় করেন ওই দপ্তর থেকেই। নাটকের প্রতি ভালবাসায় বালুরঘাটের ত্রিতীর্থ নাট্যসংস্থায় যোগ দেন ১৯৮৭ সালে। যেখানে 'চিরকুমার সভা', বিপুলৌষধি, পনন প্রভৃতি নাটকে প্রশংসিত অভিনয় করেন।

নাট্যতীর্থ:

প্রণব চক্রবর্তী:

বালুরঘাট কলেজের অধ্যাপক প্রণব চক্রবর্তী ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দের ১৭ অক্টোবর ৫ জন মহিলা শিল্পীসহ মোট ৩০ জন সদস্য তথা নাট্যশিল্পীদের নিয়ে বালুরঘাটে নাট্যতীর্থ যে যাত্রা শুরু করেছিল, তিনি তার প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন। প্রণব চক্রবর্তী একাধিক নাটকে অভিনয় করে সুনাম অর্জন করেছিলেন। তাঁর অভিনীত বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য নাটক হল— দানসাগর। সেখানে তিনি মোড়লের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। এছাড়াও 'হাজার স্বপন' নাটকে দক্ষতার সঙ্গে পরিচালনা করেছেন। তিনি একজন অত্যন্ত পারদর্শী Music Director ছিলেন।

দীপক রক্ষিত:

দীপক রক্ষিত বালুরঘাটের একজন বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তি ছিলেন। নাট্যজীবনের প্রথম দিকে নাট্যমন্দির, অভিযাত্রী প্রভৃতি নাট্যসংস্থার সাথে যুক্ত ছিলেন। ঐ সব নাট্যসংস্থাগুলিতে একাধিক নাটক যথেষ্ট বিচক্ষণতা ও দক্ষতার সাথে অভিনয় ওপরিচালনা করেছেন। পরবর্তীক্ষেত্রে তিনি

নাট্যতীর্থে যোগদান করেন এবং সেখানেও একাধিক নাটকে পরিচালনা ও অভিনয় করেন। সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল— অগ্নিগর্ভ ও মণ্ডলের ঘর গেরস্থী (অভিনেতা ও পরিচালক), কালবন্দর (অভিনয় ও পরিচালক), দানসাগর (পরিচালক), সাজান বাগান (পরিচালক) ও মহাযুদ্ধ (পরিচালক ও অভিনয়)। এইভাবে, একাধিক নাটকে পরিচালনা ও অভিনয় করে নাট্যতীর্থকে যথেষ্ট উচু স্থানে পৌঁছে দিয়েছেন দীপক রক্ষিত মহাশয়। কাটিহারে একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতায় ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দে 'অগ্নিগর্ভ, হেকেমপুর ও পরাণ মণ্ডলের ঘর গেরস্থি' নাটকটি মঞ্চস্থ করেন। এই প্রতিযোগিতায় দীপক রক্ষিত তৃতীয় শ্রেষ্ঠ অভিনেতার পুরস্কার প্রাপ্তি ঘটে।

সুনীল খাঁ:

সুনীল খাঁ মহাশয় ছোটোবেলা থেকেই নানাগুণে গুণান্বিত ছিলেন। কবিতা, ছড়া, আবৃতি, ছবি আঁকা, ফটোতোলা ইত্যাদি বিষয়ে পারদর্শী হয়ে উঠেছিলেন যা অভিনয়ে তাকে সমৃদ্ধ করেছিল। কলেজ থেকেই নাটকে অভিনয় করা শুরু করেন। ১৯৫৮ সালে বালুরঘাট কলেজের নাটকে অধ্যাপক দিগম্বর মজুমদারের ভূমিকায় অভিনয় করে দর্শকদের মুগ্ধ করে দিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি নাট্যতীর্থে যোগদেন। তাঁর অভিনীত উল্লেখযোগ্য নাটকগুলি হল— সিংহাসন, টিপুসুলতান, কাবুলিওয়ালা, আলিবাবা, ঝড়ের খেয়া, ভাওয়ালের রাজা প্রভৃতি।

শ্যামাপ্রসাদ:

বালুরঘাট কলেজের অধ্যাপক প্রণব চক্রবর্তীর প্রধান উদ্দ্যোগে ও সক্রিয় ভূমিকায় ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দ ১৭ অক্টোবর পাঁচজন মহিলা সহ মোট তিরিশজন নাট্যশিল্পী ও সদস্য নিয়ে নাট্যতীর্থ গড়ে উঠলেও নেপথ্যের সহযোগদানের অগ্রণী ছিলেন শ্যামাপ্রসাদ। নাট্যতীর্থের নাট্যকর্মীরা মূলত বালুরঘাট পৌরসভা থেকেই উঠে আসে। আর শ্যামাপ্রসাদ ছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম।

শ্যামাপ্রসাদ ছিলেন একজন সত্যিকারের সদর্থক নেপথ্যকর্মী। একজন সচেতক নাট্যকর্মী কতখানি ডেডিকেটেড হতে পারে তার প্রত্যক্ষ উদাহরণ হলো শ্যামাপ্রসাদ। স্কুল কলেজের জীবনেই 'অভিযাত্রী' ক্লাবে তাঁকে প্রথম দেখা যায়, দক্ষ একজন স্মারক বা প্রম্পটারের ভূমিকায়। এরপর নাট্যকর্মে যুক্ত হবার সুবাদে তাঁকে দেখা গিয়েছিল নাট্যমন্দিরের নাট্যচর্চায়। এরপর পরবর্তীকালে নাট্যমন্দিরে থেকে চলে আসেন 'নাট্যতীর্থ' গোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠা সদস্য হয়ে আর সেখানেই থেকে যান আমৃত্যু।

তিরিশ বছরে শ্যামাপ্রসাদ মোট আঠারোটি নাট্য প্রযোজনা করেছেন। তাঁর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল— ফস্টাসে মেকিস্টোফিলিস, মহাযুদ্ধ' নাটকে দ্বিতীয় প্রহরী, কানামামাতে কানামামা, সাজানো বাগানে বাঞ্ছারাম, দানসাগরে ঘিসু, কালাবদরে নিমাই, য্যায়সা কি ত্যায়সাতে রসিকমোহন, খারিজে

মকবুল (ডাকাত), মধ্যমানে আনন্দবাবু ইত্যাদি নাটক তাঁর অভিনয় সকল দর্শককে মুগ্ধ করেছিল। আকাশবাণী শিলিগুড়ি কেন্দ্র থেকে প্রচারিত 'কালাবদর' নাটকে শ্যামার 'নিমাই' চরিত্রটিও যথেষ্ট প্রশংসা কুড়িয়েছিল। নাট্যশাস্ত্র অনুযায়ী থিয়েটারে দরকার জিতশ্রম, স্থিতধী আর প্রত্যুৎপন্নমতির মানুষ। শ্যামপ্রসাদের মধ্যে এর প্রত্যেকটি গুণ ছিল। প্রম্পটারের পূর্ব-অভিজ্ঞতার সুবাদে ওঁর পাঠ থাক আর না থাক, গোটা বইটাই থাকত তাঁর কণ্ঠস্থ। ফলে মঞ্চে ওর সহ অভিনেতারা বরাবরই খুব দুঃচিন্তাহীন থাকতো, যে কোন ভুল ত্রুটির ব্যাপারে।

শ্যামার 'যিশু' সে থিয়েটার কমিউন'-এর নীলকণ্ঠ সেনগুপ্তের থেকে কোনো অংশেই খাটো নয়, সেটা যারা দেখেছেন তারাই মানবেন। শ্যামার যিশু, ছিল অভিব্যক্তিতে বহুমাত্রিক। শেষমেষ বলা যায়, সর্বকালে সর্বস্থানে শ্যামা প্রসাদের মতো অভিনেতা নাট্যকর্মীরা হলো আদর্শ এবং মহার্ঘ।

সুখেন্দু চৌধুরী:

সুখেন্দু চৌধুরী বালুরঘাট নাট্যতীর্থের একজন বিশিষ্ট অভিনেতা। নাট্যতীর্থের বহু নাটকে তিনি অভিনয় করেছেন। তাঁর অভিনীত নাটকগুলি হল— অগ্নিগর্ভ, হেকেমপুর ও পরাণমণ্ডলের ঘর গেরস্থি, দেওয়ালে পিঠ রেখে, ছুটির ফাঁদে, গিনিপিগ, মহাযুদ্ধ, কালাবদর, দানসাগর, খারিজ যা বালুরঘাট শহরে তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। ''অগ্নিগর্ভ হেকেমপুর ও পরাণ মণ্ডলের ঘর গেরস্থি'' নাটকে গ্রাম্য ফাঁকিবাজ শ্রমিক, 'ছুটির ফাঁদে' নাটকে বাবা, 'দেওয়ালে পিঠ রেখে' নাটকে বাবার চরিত্রে, 'মহাযুদ্ধ' নাটকে সৈনিক, 'শাস্তি' নাটকে বড় ভাই শ্রীদামের ভূমিকায়, 'কালিদাস'-এ গ্রাম্য বৃদ্ধের ভূমিকায়, ও 'খারিজ' নাটকে নগেনের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন। ১৯৮৪ সালে কাটিহার একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন, 'অগ্নিগর্ভ হেকেমপুর ও পরাণমণ্ডলের ঘর গেরাস্থি' নাটকে। এখানে সুখেন্দু চৌধুরী তৃতীয় শ্রেষ্ঠ পরিচালক পুরস্কার প্রাপ্তি ঘটে।

অজয় সাহা:

বালুরঘাট নাট্যতীর্থের একজন বিশিষ্ট অভিনেতা হলেন অজয় সাহা। বালুরঘাটের নাট্যজগতে তিনি বেশ খ্যাতি ও প্রশংসা অর্জন করেছেন। নাট্যতীর্থের প্রযোজনায় তার মঞ্চস্থ উল্লেখযোগ্য নাটকগুলি হল— সাজানো বাগান, হরেকৃষ্ণ, কানামামা, কালাবদর, খারিজ, দান সাগর, রূপের হরিণ অগ্নিগর্ভ থেকে, ধুঁয়োধুলোনক্ষত্র প্রভৃতি। তিনি সাজানো বাগান নাটকে গণৎকার হরে কৃষ্ণ নাটকে মোড়ল, খারিজ নাটকে বনমালী এবং ধুঁয়োধুলোনক্ষত্র নাটকে প্রতিনায়ক চরিত্রে অভিনয় করে দর্শকবৃন্দের মন জয় করেছিলেন।

বোয়ালদাড় বারোয়ারী নাট্য সংস্থা :

উমেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য:

উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য একজন আদর্শ সাংস্কৃতিকবোধ সম্পন্ন ব্যক্তি ও সংগঠক ছিলেন। তাঁকে বোয়ালদাড়ের নাট্যদলের জনক বলা যায়। উমেশচন্দ্র বাবুর উৎসাহ ও চেষ্টার উপর ভিত্তি করেই বোয়ালদাড়ের নাট্যদল প্রতিস্থিত হতে পেরেছে। বোয়ালদাড়ের নাট্যদলের কথা কোনোদিনও উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্যকে ছাড়া কল্পনাও করা যায় না।

অধীর সরকার:

অধীর সরকার শুধু বোয়ালদাড় নয় সমগ্র বালুরঘাট তথা দক্ষিণ দিনাজপুরের একজন বিশিষ্ট নাট্যপ্রেমী ও নাট্যমনস্ক নাট্য অভিনেতা ছিলেন। ১৯৪২ সালে পাড়ার বাসন্তী পূজাকে কেন্দ্র করেই বোয়ালদাড় বারোয়ারী নাট্যসংস্থা গড়ে উঠেছিল আর অধীর সরকার এই বোয়ালদাড় নাট্যসংস্থা থেকেই সমৃদ্ধ নাট্যঅভিনেতা হয়েছিলেন। তিনি একাধিক বিশিষ্ট অভিনেতার সাথে অভিনয় করার সুযোগ পেয়েছেন। তাঁর অভিনীত বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য নাটকগুলি হল— চন্দ্রগুপ্ত, ঈশা-খাঁ, চাঁদ রায়, আজকাল প্রভৃতি নাটকে অভিনয় করে সাড়া ফেলে দিয়েছিলেন। 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকে তিনি চাণক্যের ভূমিকায়, চাঁদ রায়, নাটকে তিনি চাঁদ রায়, ঈশা খাঁ নাটকে ঈশা খাঁ ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। 'আজকাল' (সামাজিক নাটক) নাটকে বাবার ভূমিকায় অভিনয় করে দর্শকবৃন্দকে মুগ্ধ করে দিয়েছিলেন। এছাড়াও ১৯৫৬ সালে তিনি 'সিন্ধু গৌরব' নামে একটি নাটকে অভিনয় করেছিলেন।

তথ্যসূত্র:

১. শুভাশীষ গুপ্ত - প্রাক্-স্বাধীনতা দিনাজপুর রঙ্গালয়ের ইতিহাসের পটভূমিকায় রায়গঞ্জ মঞ্চের এক-চতুর্থ শতাব্দী, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-৭৩, জানুয়ারি ২০০৯, পৃ. ১৮

২. ইন্দ্রজিৎ চক্রবর্তী ও শুভাশীষ গুপ্ত - দিনাজপুর (১৭৫৭-১৯৪৭) ১ম প্রকাশ ১৯ সেপ্টেম্বর ২০১৪, পৃ. ১০৮।)

৩. জীবেশ দাস - বহতাধারা, সুবর্ণজয়ন্তী স্মরণিকা, রায়গঞ্জ ইনস্টিটিউট, প্রকাশক জীবেশ দাস, প্রকাশকাল মার্চ, ১৯৯২, পৃ. ৩, ৪

৪. সুভাশীষ গুপ্ত - পঞ্চাশ বছর পূর্বের স্মৃতির আয়নায়-'ছন্দম', সুবর্ণজয়ন্তী স্মরণিকা, ২০১৩, ছন্দম, সম্পাদক- স্বপন বসু, রায়গঞ্জ, উত্তর দিনাজপুর, পৃ. ৪৮

৫. স্বপন কুমার বসু (সম্পাদক) - ছন্দম, ছন্দম নাট্যসংস্থা-৬৪-১৬; রায়গঞ্জ নাট্যচর্চার শতবর্ষ স্মরণিকা ১৯১৫-২০১৬, রায়গঞ্জের নাট্যচর্চার শতবর্ষ উৎযাপন কমিটি, আহ্বায়ক-শ্রী কমলেশ গোস্বামী, পৃ. ৬৪

৬. অনিল বিশ্বাস - 'নজমু কিছু স্মৃতি ও কিছু শ্রুতি', স্মরণিকা যাত্রিক নাট্যগোষ্ঠী, সম্পাদক-কানাইলাল সাহা, প্রাকাশকাল-২৭ মে মার্চ, ২০১২

৭. নরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় - 'সেকাল থেকে একাল: নাট্যচর্চা, পশ্চিম দিনাজপুর বালুরঘাট নাট্যমন্দির', নাট্যশালা শতবর্ষ স্মরণিকা, পশ্চিম দিনাজপুর, সম্পাদক-শিশির মজুমদার, রায়গঞ্জ-১৯৭৩, পৃ. ৬০-৬৩।

৮. হরিমাধব মুখোপাধ্যায় - আত্মস্মৃতিতে উত্তরবঙ্গ, পৃ. ২০১

৯. কল্যাণ দাস - বালুরঘাট নাট্যমঞ্চের অতীত বর্তমান প্রত্যুষ, পৃ. ১৮৫